।। শ্রীহরি ।।

903▲

সহজ সাধনা

(তত্ত্ব প্রাপ্তির সহজ ও সরল উপায়)

सहज साधना (बँगला)

স্বামী রামসুখদাস

॥ শ্রীহরিঃ ॥

সহজ সাধনা

(তত্ত্ব প্রাপ্তির সহজ ও সরল উপায়)

সহজ সাধনা (বাঁগলা)

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব॥

স্বামী রামসুখদাস

॥ শ্রীহরিঃ ॥

অনুবাদকের কথা

স্বামী রামসুখদাস মহারাজ কৃত **‘সহজ সাধনা’** পুস্তকটির বঙ্গানুবাদ বাংলা ভাষার ধর্ম-পুস্তক ভাণ্ডারে এক নতুন সংযোজন। পুস্তকটির নামকরণেই পুস্তক রচনার উদ্দেশ্য পরিস্ফুট। বস্তুত সাধন মার্গ বহুবিধ এবং অনেকের কাছেই তা জটিল এবং আয়াসসাধ্য। পুস্তকটিতে স্বামীজী তাঁর অনুপম বাচনভঙ্গির দ্বারা ভগবৎ সাধনার সহজ পন্থার নির্দেশ করেছেন। মুমুক্ষু মানুষ সাধন-ভজনের মধ্য দিয়ে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করতে চান। স্বামীজীর কথা হল, যে পদ্ধতিতে আমরা সাংসারিক বস্তু প্রাপ্ত করি পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তির পদ্ধতি তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তার কারণও তিনি বলেছেন, সাংসারিক বস্তুর প্রাপ্তি হল যা নেই তাকে প্রাপ্ত করা। পরমাত্মতত্ত্ব তো তা নয়। এই তত্ত্ব সর্বত্র এবং সদা বিদ্যমান। যা আছে তাকে পাওয়ার জন্য তো বিশেষ আয়াস প্রয়োজন হয় না। যা প্রয়োজন, তা হল আমার কাছে নেই, আমাকে সংগ্রহ করতে হবে—এই ভ্রান্তির নিরসন। আমার যে স্বরূপ—যে আমি দেহ, মন, বুদ্ধির দ্বারা সীমিত নয়, আমার সেই স্বরূপকেই চিনে নিতে হবে, তার মধ্যে তল্লীন হতে হবে। স্বামীজী স্পষ্টতই বলেছেন যে স্বরূপ স্বতঃ স্বাভাবিক, নির্দোষ এবং নিত্যপ্রাপ্ত।

পুস্তকটিতে নয়টি পরিচ্ছেদ আছে। বিষয়বস্তুর দিক থেকে দেখলে প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদই স্বতন্ত্র। কিন্তু চিন্তনের গভীরে গেলে দেখা যাবে যে এই নয়টি পরিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে সহজ সাধনার একটি সামগ্রিক রূপ স্পষ্ট হয়েছে। স্বামীজী এক আপাত অদ্ভুত কথা শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেন, নিবৃত্তি বা

নিষেধ সাধনার অঙ্গীভূত নয়। কারণ কী ? স্বামীজী বলেছেন, চিন্তন করলে চিত্ত সঙ্গে থাকে, মনন করলে মন সঙ্গে থাকে। তেমনই ত্যাগ করলে ত্যাগী থেকে যান। তাই মান্যতা নয়, নিষেধও নয় ; গ্রহণ নয়, ত্যাগও নয়। বরং যেমন আছেন তেমনই থাকুন, 'অস্তি'-তে স্থির থেকে নিশ্চুপ হয়ে যান। অবশ্য তার জন্যও যেন আগ্রহ না থাকে। নিশ্চুপ স্বতঃসিদ্ধ, বাহিরে এবং অন্তরে নিশ্চুপ হয়ে যাওয়াই হল সহজ সাধনার সার কথা।[১]

এমন একটি পুস্তকের অনুবাদ করা এক পুণ্য কর্ম। অনুবাদক সেই পুণ্য কর্ম তার সীমিত শক্তিতে পালন করার চেষ্টা করেছে কেবল এই ভরসা নিয়ে যে ধর্মপিপাসু বাংলাভাষী পাঠক এ থেকে রস সংগ্রহ করতে পারবেন।

—**ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়**

---

[১]সহজ-সাধনা পুস্তকের পরিপূরকরূপে **'সাধন এবং সাধ্য'** পুস্তকটি অতি অবশ্যই পঠনীয়।

নম্র নিবেদন

পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তি অভিপ্সু সাধকদের সেবার নিমিত্ত এই পুস্তকটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা খুবই আনন্দিত। আমাদের বিশ্বাস, এই পুস্তকটি সাধকদের বিবেকের বিকাশ এবং উৎসাহ বর্ধন করে তাঁদের সহজে এবং শীঘ্রই সাধ্যলাভে সহায়ক হবে। নয় সংখ্যাটি যেমন নিজে থেকেই সম্পূর্ণ তেমনই নয়টি পরিচ্ছদবিশিষ্ট এই পুস্তকটিও স্বয়ং সম্পূর্ণ। যাঁরা এটির গভীরে প্রবেশ করেন তাঁরা এ থেকে পূর্ণতা প্রাপ্ত করেন।

সাধকদের কাছে আমাদের প্রার্থনা, তাঁরা যেন কেবল তত্ত্বকে অনুভব করবার উদ্দেশ্যেই তৎপরতাপূর্বক এই পুস্তকটি অধ্যয়ন করেন। শেখা এবং শেখাবার জন্য যেন তা না করেন, তাহলেই এই পুস্তক থেকে তাঁরা প্রকৃতভাবে লাভবান হতে পারবেন।

—প্রকাশক

॥ শ্রীহরিঃ ॥

সূচীপত্র

॥ শ্রীহরিঃ ॥

১ নির্দোষিতার অনুভূতি

ভগবানের সাক্ষাৎ অংশ হওয়ার কারণে ভগবানের সঙ্গে জীবের সাধর্ম্য আছে। অতএব ভগবান যেমন নির্দোষ (দোষ-গুণের অতীত), জীবও সেইরূপ স্বরূপত সর্বতোভাবে নির্দোষ। এই নির্দোষিতা নিজের প্রচেষ্টায় প্রাপ্ত নয়, তা স্বতঃসিদ্ধ এবং সহজ—

ঈশ্বর অংস জীব অবিনাসী। চেতন অমল সহজ সুখরাসী॥

(শ্রীশ্রীরামচরিতমানস ৭।১১৭।১)

মানুষের মধ্যে এই কথা চেপে বসে আছে যে আমরা দোষ দূর করব, নির্দোষ হব, তাহলেই ভগবৎ প্রাপ্তি হবে। কিন্তু সাংসারিক বস্তুসামগ্রী পাওয়ার যে পদ্ধতি সেই পদ্ধতি পরমাত্মতত্ত্ব পাওয়ার জন্য নয়। সাংসারিক বস্তুসামগ্রী পাওয়া তো অপ্রাপ্তকে পাওয়া। কিন্তু পরমাত্মতত্ত্বকে পাওয়া নিত্য প্রাপ্তিকে পাওয়া। স্বরূপ স্বতঃই স্বাভাবিকভাবে নির্দোষ এবং নিত্যপ্রাপ্ত। অতএব এই নির্দোষিতাকে স্বীকার করে নিতে হবে, তাকে সৃষ্টি করতে হবে না এবং দোষগুলি থেকে নিবৃত্ত হতে হবে, সেগুলিকে দূর করতে হবে না। তাৎপর্য হল, নিজেদের মধ্যে নির্দোষিতা বাস্তবে বিদ্যমান, দোষযুক্তি হল মেনে নেওয়া ব্যাপার। অতএব এই মেনে নেওয়া ব্যাপারকে ছাড়তে হবে। যদি দোষগুলিকে নিজেদের মধ্যে বিদ্যমান স্বীকার করে নিয়ে সেগুলিকে দূর করতে সচেষ্ট হন তো সেগুলি দূর হবে না, বরং আরও দৃঢ় হয়ে যাবে। কেননা দোষগুলিকে নিজেদের মধ্যে মেনে নিয়ে সেগুলিকে সত্তা দেবেন, তবেই না সেগুলিকে দূর করতে সচেষ্ট হবেন!

প্রত্যেক সাধকেরই এই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে সাধনা করার আগে

দোষগুলি যতটা তীব্রতার সঙ্গে আসত এখন আর ততটা তীব্রতার সঙ্গে আসে না ; যতক্ষণ পর্যন্ত অবস্থান করত এখন আর ততটা করে না এবং যত তাড়াতাড়ি আসত এখন আর তত তাড়াতাড়ি আসে না। নিজেদের মধ্যে এইরকম পার্থক্য দেখে সাধকদের এই ভেবে উৎসাহিত হওয়া উচিত যে বাস্তবে দোষ আমাদের মধ্যে নেই। তা যদি হত তাহলে এই এই পার্থক্য হত না। তাৎপর্য হল এই যে, পার্থক্য দেখা গেল দোষে, নিজেদের মধ্যে নয়। তাহলে দোষ নিজস্বতা থেকে ভিন্ন।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য প্রভৃতি যত দোষ আছে, সব অসৎ এবং সেগুলি অসতের সম্বন্ধ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। যেমন ঘুমের সঙ্গে সম্বন্ধ হলে জাগৃতি বিস্মৃত হয়ে যায় এবং মানুষ স্বপ্ন দেখে, তেমনই অসতের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হলে দোষশূন্যতা বিস্মৃত হয়ে যায় এবং দোষ দৃষ্ট হতে থাকে। স্বপ্ন দেখার মতো দোষও দৃষ্ট হয়, কিন্তু বাস্তবে তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই।

দোষ আগন্তুক, কিন্তু নির্দোষ স্বরূপ আগন্তুক নয়। সকলেরই এই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, দোষ এলেও আমরা থাকি এবং দোষ চলে গেলেও আমরা থাকি। দোষ আসে এবং যায়, কিন্তু আমরা আসা-যাওয়া করি না, বরং যেমনকার তেমনই থেকে যাই। দোষের যাওয়া-আসা আমরা দেখি, তাতে আমরা যে স্থায়ীরূপে নির্দোষ এটিই প্রমাণিত হয়। তার কারণ নির্দোষ না হলে দোষের উপলব্ধি হবে কী করে ? আমরা নির্দোষ তাই দোষের উপলব্ধি হয় এবং যার উপলব্ধি হয় সে উপলব্ধ বিষয় থেকে দূরে থাকে। দোষ যেমনই হোক না কেন তা মন এবং বুদ্ধিতেই হয়, নিজের মধ্যে কখনো হয় না। তবে মন এবং বুদ্ধির সঙ্গে তাদাত্ম্য হয়ে গেলে দোষকে নিজের বলে মনে হয়। প্রকৃতির কার্য হওয়ায় মন-বুদ্ধিও দোষী এবং অনিত্য। আমাদের সম্বন্ধ মন-বুদ্ধির সঙ্গেও নেই এবং তাতে (মন-বুদ্ধিতে) আগত দোষের সঙ্গেও নেই।

যার আদি এবং অন্ত নেই তার মধ্যমও নেই। সিদ্ধান্ত

হল—**'আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্তমানেঽপি তত্তথা'** (মাণ্ডূক্যকারিকা ৪।৩১)। যেমন, দর্পণে মুখ আগেও ছিল না পরেও থাকবে না এবং বর্তমানে প্রত্যক্ষ হলেও বাস্তবে তা নেই, তেমনই নিজের মধ্যে দোষ আগেও ছিল না, পরেও থাকবে না এবং বর্তমানে দেখা গেলেও তা নিজের মধ্যে নেই। যেমন দর্পণে মুখের প্রতীতি হয় তেমনি নিজের মধ্যে দোষও প্রতীতি হয়, বাস্তবে দোষ নেই।

নিজের মধ্যে যেমন দোষ নেই, অন্যের মধ্যেও তেমনই দোষ নেই। সকলের স্বরূপ স্বতঃই নির্দোষ। অতএব কখনো কাউকে দোষী মনে করা উচিত নয় অর্থাৎ নির্দোষ স্বরূপের দিকেই সর্বদা দৃষ্টি থাকা উচিত। এইরকমই মনে করা উচিত যে, সে আগন্তুক দোষের বশীভূত হয়ে কাজ করে ফেলেছে। কিন্তু সেই কর্ম স্থায়ী নয় এবং তার ফলও স্থায়ী হবে না। কর্ম এবং ফল থাকবে না, কিন্তু স্বরূপ থেকে যাবে। আমরা যদি অন্যের মধ্যে দোষ মেনে নিই তাহলে তার মধ্যে সেই দোষ এসে যাবে ; কারণ তার মধ্যে দোষ দেখলে আমাদের ত্যাগ, তপস্যা, বল প্রভৃতিও সেই দোষ সৃষ্টি করতে সহায়ক হয়ে যাবে এবং তাতে সেই ব্যক্তি দোষী হয়ে যাবে। সুতরাং (সিদ্ধান্তের দৃষ্টিতে) পুত্র, শিষ্য প্রভৃতিকে স্বরূপত নির্দোষ গণ্য করে এবং তাদের মধ্যে যে দোষ দেখা যায় তাকে আগন্তুক মনে করে তাদের (ব্যবহারিক দৃষ্টিতে) শিক্ষা দেওয়া উচিত। তাদের মধ্যে দোষশূন্যতা মেনে নিয়ে তাদের মধ্যে আগত দোষকে দূর করার চেষ্টা করা উচিত।

যদি মন এবং বুদ্ধিতে দোষ সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে তার বশে থাকা উচিত নয়—**'তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ'** (গীতা ৩।৩৪) অর্থাৎ তদনুসারে কোনো কাজ করা উচিত নয়। তার বশীভূত হয়ে কাজ করলে সেই দোষ দৃঢ় হয়ে যাবে। কিন্তু তার বশীভূত হয়ে কাজ না করলে একটি উৎসাহ সৃষ্টি হবে। যেমন, কেউ আমাদের কড়া কথা বলল, কিন্তু আমাদের রাগ হল না, তাতে আমাদের মধ্যে এই উৎসাহ এবং প্রসন্নতা হবে যে আজ

তো আমরা বেঁচে গেলাম। তবে এতে নিজেদের প্রয়াসের কথা না ভেবে ভগবানের কৃপাই মেনে নিতে হবে। ভগবানের কৃপাতেই বেঁচে গেলাম, নইলে এর বশীভূত হয়ে যেতাম। এইভাবে সাধক যদি কখনো কোনো দোষ দেখেন তাহলে তার বশীভূত যেন না হন এবং তাকে নিজের মধ্যেও যেন মনে না করেন।

প্রধান দোষ হল, যে স্বাতন্ত্র্য পাওয়া গিয়েছে তার অপব্যহার। আমরা অসতের সত্তা মেনে নিতে পারি, আবার না-ও পারি ; আমরা ছল, কপট, হিংসা প্রভৃতি করতেও পারি, আবার না-ও পারি — এই স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি। যবে থেকে আমরা এই স্বাধীনতার অপব্যবহার শুরু করেছি তবে থেকেই জন্ম-মৃত্যু শুরু হয়েছে। এজন্য সাধকের উচিত প্রাপ্ত স্বাধীনতার অপব্যবহার না করা। অপব্যবহার না করলে দোষশূন্যতা সুরক্ষিত থাকবে।

মানুষ যখন প্রাপ্ত স্বাধীনতার অপব্যবহার করে অসতের সঙ্গ নেয় তখন সে অসতের সংসর্গজনিত সুখে আসক্ত হয়ে পড়ে। সংসর্গজনিত সুখের আসক্তি থেকে সকল দোষের সৃষ্টি হয়।

অসৎ বস্তুগুলির প্রতি যে রুচি (আসক্তি), ভোগ এবং সঞ্চয়ের মধ্যে ভালোত্ব দেখা যায়, সুখ দেখা যায় এবং সেগুলি পাওয়ার যে ইচ্ছা হয় —সেগুলিই হল সকল দোষের মূল। যারা দুঃখী তাদের মধ্যেই সংসর্গজনিত সুখের ইচ্ছা সৃষ্টি হয়। দুঃখী মানুষই সুখের ইচ্ছা করে এবং সুখও সে-ই অনুভব করে যে দুঃখী। যেমন যে ক্ষুধার্ত সে-ই আহারের সুখ লাভ করে। সুখের পর দুঃখ আসে, এই হল নিয়ম—**'যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে'** (গীতা ৫।২২)। এইভাবে সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখের পর সুখ হয়— এটি বুঝতে পারলে সুখের ইচ্ছা চলে যায় ; কেননা কেউই দুঃখ চায় না। সুখের ইচ্ছা ছেড়ে দিলে স্বতঃসিদ্ধ দোষশূন্যতার অনুভূতি হয়ে যায়।

দোষশূন্যতা কৃতিসাধ্য নয়। দোষশূন্যতাকে কৃতিসাধ্য মনে করলে

অহংকার হয় আর এটিই হল সকল দোষের আশ্রয় (মূল)। প্রকৃতপক্ষে দোষশূন্যতা স্বতঃসিদ্ধ, স্বাভাবিক এবং সহজ। এই দোষশূন্যতাকে রক্ষা করা সাধকের কাজ। দোষশূন্যতা রক্ষা করার তাৎপর্য হল নিজের মধ্যে দোষশূন্যতাকে নিরন্তর স্থায়ীরূপে স্বীকার করা এবং নিজের মধ্যে দোষকে স্বীকার না করা। আমার মধ্যে দোষ নেই—এই কথা মেনে নেওয়ার পরও যদি কখনো দেখা যায় যে দোষ এসেছে তাহলে 'হে নাথ ! হে প্রভু !' এই বলে ভগবানকে ডাকা উচিত। ভগবান তাঁর শরণাগত ভক্তদের যোগ এবং ক্ষেম বহন করেন — **'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্'** (গীতা ৯।২২) অর্থাৎ নির্দোষিতাকে রক্ষা করেন এবং আগত দোষকে দূর করেন। তাহলে আমরা কেন চিন্তা করব ? যাঁর কৃপায় আমাদের মধ্যে দোষশূন্যতার বোধ হয়েছে তিনিই সেই দোষশূন্যতাকেও রক্ষা করবেন। এইভাবে ভগবানের কৃপাকে স্বীকার করলে দোষের আসা-যাওয়াও বন্ধ হয়ে যাবে।

দোষশূন্যতাকে অনুভব করবার জন্য ভগবানকে ডাকা যেমন এক উপায় তেমনই দোষশূন্যতার দৃঢ় স্বীকৃতিও একটি উপায়। 'অস্তি' রূপে নিজেদের যে সত্তা তা সর্বতোভাবে নির্দোষ। কেবল সত্তাতে কোনো দোষ, বিকার থাকা সম্ভবই নয়। সেই নির্দোষিতাতে সকলের স্থিতি স্বত, স্বাভাবিক, সহজ, নিত্য এবং স্বয়ংসিদ্ধ। নিজেদের এই দোষশূন্যতাকে দৃঢ়তার সঙ্গে স্বীকার করে ভিতরে-বাইরে চুপ করে থাকুন। চুপ করে থাকলে অর্থাৎ নির্দোষ সত্তাকে গুরুত্ব দিলে নিজে থেকেই দোষগুলির অবিদ্যমানতা অনুভূত হবে। এই অনুভূতি একবার হয়ে গেলে তা চিরকালের জন্য তেমনই থাকে ; কেননা এটি অভ্যাস নয়, বরং এটি হল বাস্তবিকতার অনুভূতি।

~~○~~

২ নিত্যযোগ এবং তার অনুভূতি

প্রকৃতি এবং পুরুষ—দুটিকেই অনাদি বলা হয়েছে **'প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি'** (গীতা ১৩।১৯)। অনাদি হলেও দুটির স্বভাব ভিন্ন। প্রকৃতিতে তো সবসময় ক্রিয়া হতে থাকে, কিন্তু পুরুষে ক্রিয়া হয়ই না। দুটির মধ্যেকার এই প্রভেদ ভালো করে বুঝে নেওয়া উচিত।

শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে প্রকৃতির একটি অক্রিয় অবস্থা এবং একটি সক্রিয় অবস্থা হয়ে থাকে। কিন্তু বাস্তবে সক্রিয় অবস্থার অপেক্ষায় অক্রিয় অবস্থা বলা হয়ে থাকে। প্রকৃতির সূক্ষ্ম ক্রিয়া অক্রিয় অবস্থাতেও কখনো বন্ধ হয় না। যেমন, আমরা কখনো জাগ্রত অবস্থায় কাজকর্ম করে থাকি আবার কখনো সব কাজ বন্ধ করে নিদ্রা যাই ; কিন্তু শরীরের বিনাশের ক্রিয়া কখনো বন্ধ হয় না। নিদ্রার মধ্যে তিন রকমের ক্রিয়া হয়। একটি ক্রিয়া নিদ্রাকে গাঢ় করার জন্য হয়[১], একটি ক্রিয়া ক্লান্তি দূর করে সতেজ করার জন্য হয় এবং তৃতীয় ক্রিয়া শরীরকে বিনষ্ট করার জন্য (বয়স বেড়ে যাবার) হয়ে থাকে। বিনাশ করার এই ক্রিয়া স্বত স্বাভাবিক নিরন্তর হতে থাকে। সৃষ্টি'র প্রারম্ভ থেকেই এই ক্রিয়া হতে থাকে এবং সৃষ্টির লয়ের সময়েও বজায় থাকে। সৃষ্টির লয় হলে প্রকৃতি নিষ্ক্রিয় বলা হয়। কিন্তু কোন বিষয়ে ? সৃষ্টি-রচনার বিষয়ে। প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতি কখনোই নিষ্ক্রিয় থাকে না। জাগ্রতাবস্থায়, স্বপ্নে, সুষুপ্তিতে, মূর্ছায়, সমাধিতে, সর্গে, প্রলয়ে, মহাসর্গে, মহাপ্রলয়ে সমস্ত সময়ে প্রকৃতিতে ক্রিয়া হতে থাকে। মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, পৃথিবী, শরীর,

---

[১]নিদ্রা যাবার সময় কেউ যদি মাঝখানে জাগিয়ে দেয় তাহলে আমরা বলি কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে নিদ্রার সময় গাঢ় হবার ক্রিয়া চলতে থাকে।

ধনসম্পদ, বৈভব প্রভৃতি এবং তারা, নক্ষত্র, সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী, সমুদ্র প্রভৃতি যত দৃশ্য (প্রকৃতির কার্য) দেখা যায় সবেতেই প্রতিমুহূর্ত ক্রিয়া হচ্ছে। এই প্রাকৃত ক্রিয়ার উৎপত্তি এবং বিনাশের একটি ক্রম (প্রবাহ) চলে আর এই ক্রমই স্থিতি রূপে দেখা যায়। বাস্তবে স্থিতি নেই। যেমন, আমরা বলে থাকি গঙ্গার জল গতকালের জায়গাতেই প্রবাহিত হচ্ছে। এতে দু'টি কথা আছে—(১) গতকালের জায়গায় এবং (২) প্রবাহিত হচ্ছে। এর তাৎপর্য হল, গতকালের জায়গায় প্রবাহিত হলেও জল স্থির নয়, তা অবিরাম প্রবাহিতই হচ্ছে। তেমনই এই শরীর-সংসারকে স্থির বলে মনে হলেও তা নিরন্তর বয়ে চলেছে, বিনাশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পরমাত্মতত্ত্ব এবং নিজ স্বরূপে ক্রিয়া নেই। এ সর্বদা যেমনকার তেমনই থাকে। যদি এতে বিন্দুমাত্রও ক্রিয়া হত তাহলে সর্বদা যেমনকার তেমন থাকত না, বরং বদলেই যেত।

প্রকৃতির প্রত্যেক ক্রিয়া আমাদের স্বরূপ থেকে নিরন্তর পৃথকভাবে হয়ে যাচ্ছে আর তা আলাদা হয়েই আছে। এই অভিজ্ঞতা সকলেরই হয়েছে যে বাল্যাবস্থায় আমি এরূপ করতাম আর এখন এরূপ করি। কিন্তু বাল্যাবস্থায় যে আমি ছিলাম সেই আমিই এখনও আছি। বালক থেকে যুবা এবং যুবক থেকে বৃদ্ধ হয়ে গেলাম—এটি হল প্রাকৃত ক্রিয়া এবং আমি সেই একই থাকলাম—এটি হল অক্রিয় স্বরূপ। বালক থেকে যুবা এবং যুবক থেকে বৃদ্ধ হওয়ার জন্য কোনো চেষ্টা করতে হয় না, বরং এই পরিবর্তন-রূপ ক্রিয়া শরীরের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই হচ্ছে। স্বয়ং শরীরের সঙ্গে নিজ সম্বন্ধ মেনে নেওয়ায় শরীরে সংঘটিত ক্রিয়াগুলিকে নিজস্ব বলে মনে হয় ; যেমন আমি বালক, আমি যুবক, আমি বৃদ্ধ, আমি রোগী, আমি নীরোগ ইত্যাদি। শরীরের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ মেনে নেওয়াই হল অজ্ঞানতা এবং শরীরকে স্বয়ং থেকে সর্বতোভাবে পৃথক অনুভব করাই হল জ্ঞান—

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞযোর্জ্ঞানং যত্তদ্জ্ঞানং মতং মম। (গীতা ১৩।২)

সাধকের এই অনুভূতি হওয়া উচিত যে যা কিছু ক্রিয়া হয় সবই শরীরে হয়। বয়সও শরীরেই হয়। স্বয়ং-এর বয়স হয় না। কালও শরীরকে খেয়ে পেলে। স্থূল শরীরের ক্রিয়া হোক, সূক্ষ্ম শরীরের চিন্তন, মনন, ধ্যান প্রভৃতি ক্রিয়া হোক অথবা কারণ শরীরের সমাধি[১] হোক, সমস্তকেই কাল নিরন্তর খেয়ে ফেলে। কিন্তু স্বয়ংকে কাল খায় না। স্বয়ং-এ কোনো ক্রিয়া হয় না। সে হল সমস্ত ক্রিয়ার সাক্ষী। সেই ক্রিয়ারহিত স্বয়ং-এ নিজের স্বাভাবিক স্থিতি অনুভব করাই হল মুক্তি এবং ক্রিয়াসহ শরীরে স্থিত থাকা হল বন্ধন।

ক্রিয়া এবং অক্রিয়াকে ভাষান্তরে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিও বলা যেতে পারে। সংসারের প্রত্যেক প্রবৃত্তির স্বতঃই নিবৃত্তি হয়ে যাচ্ছে। প্রবৃত্তির সময়েও নিবৃত্তি যেমনকার তেমনই থাকে। আমরা ঘুমিয়ে থাকি, জেগে থাকি, বসি, চলি, শুনি, কথা বলি এই সবগুলি ক্রিয়াতেও বিনাশাভিমুখী ক্রিয়া (নিবৃত্তি) নিরন্তর হতে থাকে। এই নিবৃত্তি নিত্য। এর কখনো বিনাশ হয় না। এই নিত্য নিবৃত্তিকেই গীতা **'গুণা গুণেষু বর্তন্তে'** (গীতা ৩।২৮), **'ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্তে'** (৫।৯) প্রভৃতি পদের দ্বারা ব্যক্ত করেছেন।

আমরা বস্তু প্রাপ্ত করার জন্য প্রবৃত্তি করে থাকি, কিন্তু বাস্তবে তা প্রাপ্ত হয় না, বরং নিবৃত্তিই হয়ে যায়। যেমন, ধন প্রাপ্ত হয়ে গেল, কিন্তু বাস্তবে ধনের নিবৃত্তি হল। কোনো লোককে পঞ্চাশ বছর ধনী থাকতে হবে এবং তার এক বছর অতিক্রান্ত হল। তাহলে এখন আর সে পঞ্চাশ বছর ধনী থাকবে না, তার এক বছরের ধনাঢ্যতা নিবৃত্ত হয়ে গেল। এইভাবে প্রতিটি ক্রিয়া নিরন্তর আমাদের কাছ থেকে নিবৃত্ত হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ আলাদা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সংলগ্নতার প্রতি রুচি থাকার কারণে আমরা নিবৃত্তিতেও প্রবৃত্তি দেখে থাকি। যদি সংলগ্নতার প্রতি রুচি চলে যায় তাহলে নিত্যযোগের অনুভূতি হবে।

---

[১]সমাধিতেও ক্রিয়া হয়, কেননা এতেও উত্থান হয়ে থাকে।

নিজের স্বরূপে অথবা পরমাত্মতত্ত্বতে নিজের স্থিতির নাম নিত্যযোগ। সমস্ত সাধনার উদ্দেশ্য হল এই নিত্যযোগের প্রাপ্তি করা। এই নিত্যযোগই গীতার যোগ। এর পরিভাষা ভগবান দু'ভাবে করেছেন—(১) সমতার নাম যোগ—'**সমত্বং যোগ উচ্যতে**' (২।৪৮) এবং (২) দুঃখস্বরূপ সংসারের সংলগ্নতার বিয়োগের নাম যোগ—'**ত্বং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসজ্ঞিতম্**' (৬।২৩)। সমতাই বলুন আর সংসারের সংলগ্নতা থেকে বিয়োগই বলুন, দুটি একই কথা। তাৎপর্য হল, সমতায় স্থিতি হলে সংসারের সংলগ্নতার বিয়োগ হয়ে যাবে এবং সংসারের সংলগ্নতার বিয়োগ হয়ে গেলে সমতার স্থিতি হয়ে যাবে। দুটির মধ্যে যে-কোনো একটি হলেই নিত্যযোগের প্রাপ্তি হয়ে যাবে। একেই শাস্ত্রে মূলাবিদ্যাসহ জগতের নিবৃত্তি এবং পরমানন্দের প্রাপ্তি বলা হয়েছে। গীতা মূলাবিদ্যাসহ নিবৃত্তিকে বলছেন—'**তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসজ্ঞিতম্**' এবং পরমাত্মার প্রাপ্তিকে বলেছেন—'**সমত্বং যোগ উচ্যতে**'। মূলাবিদ্যাসহ জগতের নিবৃত্তির নামও যোগ এবং পরমানন্দের প্রাপ্তির নামও যোগ। এই যোগের প্রাপ্তিতে সংলগ্নতার রুচি এবং ক্রিয়ার রুচিই বিশেষ বাধা। পদার্থ ভালো লাগে, কিছু করতে ভালো লাগে—এইটিই হল বিশেষ বাধা। পদার্থ এবং ক্রিয়া প্রকৃতির স্বরূপ। যদি পদার্থ এবং ক্রিয়াগুলির প্রতি আকর্ষণ না থাকে তাহলে নিজের অক্রিয় স্বরূপের স্বতঃই অনুভব হয়ে যাবে[১]। মূলে পদার্থের সংলগ্নতার রুচিই বাধা, কেননা সংলগ্নতার প্রতি রুচি থাকলে ক্রিয়ার প্রতি রুচি হয়। ক্রিয়ার প্রতি রুচি থেকে কর্তৃত্বাভিমান আসে আর কর্তৃত্বাভিমান থেকে দেহাভিমান দৃঢ় হয়। যদি

---

[১] যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্মস্বনুষজ্যতে।
সর্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে।। (গীতা ৬।৪)

'যখন ইন্দ্রিয়ের ভোগে এবং কর্মে আসক্তি থাকে না সেইসময় সকল সংকল্পত্যাগী মানুষ যোগারূঢ় হয়েছেন বলা হয়।'

সংলগ্নতার প্রতি রুচি না থাকে তাহলে ক্রিয়ার প্রতি রুচি হবে না ; কেননা কোনো না কোনো প্রয়োজনের সিদ্ধির জন্যই ক্রিয়া করা হয়ে থাকে।

সংলগ্নতার প্রতি রুচি কী করে দূর হবে ? এর তিনটি উপায় আছে—কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ[১]। কর্মযোগে—যে কাজই করবেন অন্যের হিতের জন্য করবেন, নিজের জন্য নয়। স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ শরীরের সকল ক্রিয়া অপরের হিতের জন্য করলে নিজের মধ্যে ক্রিয়া এবং পদার্থের রুচি নষ্ট হয়ে যাবে[২]। জ্ঞানযোগে— সকল ক্রিয়া প্রকৃতি এবং প্রকৃতির কার্যে হতে থাকে, নিজের স্বরূপে কোনো ক্রিয়া হয় না— এই বিবেককে গুরুত্ব দিলে এই রুচি দূর হয়ে যাবে। ভক্তিযোগে—সকল ক্রিয়া ভগবানের প্রসন্নতার জন্য করলে এই রুচি দূর

---

[১]যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োহন্যোহস্তি কুত্রচিৎ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২০।৬)

'নিজ কল্যাণ প্রার্থী মানুষদের জন্য আমি তিনটি যোগমার্গ জানিয়েছি —জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ এবং ভক্তিযোগ। এই তিনটি ছাড়া কল্যাণের অন্য কোনো পথ নেই।'

[২]একটি হল ক্রিয়া, আর একটি হল কর্ম এবং অন্যটি হল কর্মযোগ। শরীর বালক থেকে যুবা এবং যুবক থেকে বৃদ্ধ হয়—এটি হল ক্রিয়া। ক্রিয়ায় পাপ হয় না, পুণ্যও হয় না ; বন্ধন হয় না, মুক্তিও হয় না। যেমন, গঙ্গার প্রবাহের ক্রিয়া। তাতে কেউ ডুবে মারা গেল অথবা চাষের জন্য পরোপকার হয়ে গেল, তাতে গঙ্গার পাপ-পুণ্য কিছু হয় না। যখন মানুষ ক্রিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত করে কর্তা হয়ে যায় তখন তা ফলজনিত কর্ম হয়ে যায়। কর্ম থেকে বন্ধন হয়। কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি পাবার জন্য যখন মানুষ নিঃস্বার্থভাবে কেবল অপরের হিত করবার জন্য কর্ম করে তখন তা কর্মযোগ হয়ে যায়। কর্মযোগে বন্ধন দূর হয়, মুক্তি লাভ হয়—

'যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে' (গীতা ৪।২৩)

'যজ্ঞার্থাৎকর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ' (গীতা ৩।৯)

হয়ে যাবে। এইভাবে ক্রিয়াগুলি সংসারের জন্য করুন অথবা প্রকৃতিতে হচ্ছে বলে মেনে নিন কিংবা ভগবানের জন্য করুন। ক্রিয়াগুলির সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ মানবেন না ; কেননা সম্বন্ধ মেনে নিলেই নিজেদের মধ্যে কর্তৃত্ব এবং ভোক্তৃত্ব আসে। ক্রিয়াগুলির সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ না মানলে করার এবং পাওয়ার রুচি চলে যাবে এবং নিত্যযোগ অনুভূত হবে।

আমরা যেন ভোগ্যসামগ্রী পাই, টাকাপয়সা পাই, এইরকম সংলগ্নতার রুচিতে আমরা নিবিষ্ট থাকি, কিন্তু সংলগ্নতা তো বজায় থাকে না। কারণ সংসার থেকে বিচ্ছেদ তো সবসময় হচ্ছে। যার সঙ্গে নিত্য বিচ্ছেদ হয় তার সঙ্গে সংযোগ হবে কী করে ? নিজ স্বরূপ থেকে সংসারের নিত্য-বিচ্ছেদ স্বতঃই হচ্ছে। আগে থেকে বিচ্ছেদ ছিলই, ভবিষ্যতেও বিচ্ছেদ থাকবে আর বর্তমানে যখন তার সংলগ্ন হয়ে আছি তখনও নিরন্তর বিচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে। তাৎপর্য হল এই যে, সংসারে বিচ্ছেদ-ই হল সত্য। বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার পর আবার যে সংলগ্নতা হবে তার কোনো ঠিক নেই, কিন্তু যে সংলগ্ন হয়েছে তার তো বিয়োগ অবশ্যই হবে ; কেননা সংসারের সংলগ্নতা অনিত্য আর বিচ্ছেদ হল নিত্য।

সংসারের সংলগ্নতায় কেবল দুঃখই আছে। এইজন্য ভগবান সংসারকে দুঃখরূপ বলেছেন—**'দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসজ্ঞিতম্'** (৬।২৩) ; **'দুঃখালয়ম্'** (৮।১৫)। কারণ এই যে, প্রত্যেক সংলগ্নতার বিচ্ছেদ হবেই ; আর বিচ্ছেদে দুঃখ হয় ; এই অভিজ্ঞতা সকলের। আমরা যদি সংলগ্ন হওয়ার ইচ্ছা ত্যাগ করি তাহলে বিচ্ছেদ হলে দুঃখ হবে না। সংলগ্নতার ইচ্ছাই হল দুঃখের আবাস। সংলগ্ন হওয়ার ইচ্ছা হয় কেন ? কারণ আমরা সংলগ্নতাজনিত সুখ ভোগ করি, ফলে অন্তঃকরণে তার সংস্কার সৃষ্টি হয়। একে বাসনা বলে। তারপর ভোগ্যসামগ্রী যখন সামনে এসে যায় তখন সেই বাসনা জাগ্রত হয়।

তাতে সংলগ্নের প্রতি রুচি সৃষ্টি হয়। সংলগ্নতার রুচি থেকে ইচ্ছার জন্ম হয়। এইজন্য ভগবান বলেছেন যে সংলগ্নতা থেকে যত সুখ হয়ে থাকে সেই সবের-ই আদি-অন্ত আছে এবং তা দুঃখসমূহের কারণ। অর্থাৎ তা থেকে কেবল দুঃখই সৃষ্টি হয়ে থাকে। তাই বিবেকবান মানুষ তাতে রমণ করেন না।[১] তার কারণ হল সংযোগজনিত সুখগুলির বিচ্ছেদ হবেই। তাই যদি তাতে রমণ করার ইচ্ছা করেন তাহলে তা দুঃখই দেবে।

আমাদের স্বরূপ থেকে সমস্ত প্রাকৃত বস্তু এবং ক্রিয়ার নিরন্তর বিচ্ছেদ হচ্ছে। বিচ্ছেদ করতে হয় না, বিয়োগ স্বতঃই, স্বাভাবিক এবং সহজেই হয়ে যায়। এই বিচ্ছেদকে যদি আমরা স্বীকার করে নিই অর্থাৎ সংলগ্ন থাকার সময়েই যদি বিচ্ছেদকে অনুভব করে নিই তাহলে সংলগ্নতার ইচ্ছাই দূর হয়ে যাবে। সংলগ্নতার ইচ্ছা দূর হয়ে গেলে সহজেই যোগ প্রাপ্তি হয়ে যাবে। তার প্রাপ্তির জন্য কিছু করতে হবে না। কারণ হল, বাস্তবে যোগ স্বয়ং স্বাভাবিকভাবেই স্বতঃপ্রাপ্ত। শরীরের জাগৃতি, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, মূর্ছা এবং সমাধি অবস্থাতে তথা সংসারের সর্গ, প্রলয়, মহাসর্গ এবং মহাপ্রলয় অবস্থাতেও যোগ যেমনকার তেমনই থাকে। সকল দেশ, কাল, ক্রিয়া, বস্তু, ব্যক্তি, অবস্থা, পরিস্থিতি, ঘটনা প্রভৃতিতে যেমনকার তেমন থাকে বলে একে ‘নিত্যযোগ’ বলে।

নিরন্তর যার বিচ্ছেদ হয় তার সঙ্গে সংলগ্ন হওয়ার ইচ্ছা যদি ত্যাগ করেন তাহলে যোগ প্রাপ্ত হবে অথবা অস্তিরূপ ‘এক’ পরমাত্মতত্ত্বতে যদি স্থিত হয়ে যান তাহলে যোগের প্রাপ্তি হবে এবং সংসারের সঙ্গে বিচ্ছেদ স্বতঃই হয়ে যাবে। দুটির একটিকে যদি করে নেন তো দুটি নিজে থেকেই হয়ে যাবে। এতে মার্মিক কথা হল এই যে আলাদা তা থেকেই

---

[১]যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥ (গীতা ৫।২২)

হতে হবে যা আগে থেকেই আলাদা হয়ে আছে তথা আলাদা হয়ে যাচ্ছে এবং তাকেই প্রাপ্ত করতে হবে যা আগে থেকেই প্রাপ্ত হয়ে আছে। আমাদের সংসার থেকে আলাদা হতে হবে— এর তাৎপর্য হল সংসার সর্বদাই আমাদের থেকে ভিন্ন হয়ে আছে ; আর আমাদের পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করতে হবে—এর তাৎপর্য হল পরমাত্মা সর্বদাই সকলের প্রাপ্ত হয়ে আছেন। অর্থাৎ সংসারের বিচ্ছেদ এবং পরমাত্মার নিত্যযোগ ক্রিয়াসাধ্য নয়, বরং দুটিই সহজ এবং স্বাভাবিক। প্রয়োজন হল সংলগ্নতার প্রতি যে রুচি আগে থেকেই স্বীকৃত হয়ে আছে, তাকে দূর করা। স্বীকৃত সংলগ্নতার রুচি ত্যাগ করুন অথবা পরমাত্মার সঙ্গে নিজেদের নিত্যযোগ চিনে নিন ; যা আগে ছিল, পরেও থাকবে এবং এখনও যেমনকার তেমনই আছে।

~~O~~

৩ ভগবানে আপনত্ব

প্রকৃতপক্ষে কোনো মানুষই অনাথ নয়। সকল মানুষই সনাথ। সংসারে প্রত্যেক জিনিসেরই কেউ না কেউ মালিক আছেন। তাহলে মানুষের কোনো মালিক নেই এ কেমন করে হতে পারে ? যিনি সকলের মালিক সেই ভগবান আমাদেরও মালিক। আমরা তাঁকে আমাদের মালিক বলে মানি বা না-ই মানি, জানি অথবা না-ই জানি ; তিনি কিন্তু আমাদের নিজের বলেই জানেন। তাই নিজেদের অনাথ মনে করা আমাদের ভুল।

মানুষ কেন নিজেকে অনাথ বলে মনে করে ? যখন সে কোনো বস্তু বা ব্যক্তিকে নিজের বলে মনে করে তখন সেই বস্তু বা ব্যক্তি অবিদ্যমান হলে মানুষ নিজের মধ্যে অনাথ-বোধ অনুভব করে। নিয়ম হল যখন মানুষ নিজেকে কোনো বস্তুর বা ব্যক্তির মালিক মনে করে তখন সে নিজের মালিককে ভুলে যায়। যেমন শিশু মাকে ছাড়া থাকতে পারে না, কিন্তু যখন সে বড় হয়ে যায় আর স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতিকে নিজের বলে মনে করতে থাকে তখন সে তার সেই মাকেই উপেক্ষা করতে থাকে। এইজন্য, গীতায় ভগবান শরীরকে যারা নিজের বলে মনে করে অর্থাৎ নিজেদের শরীরের মালিক মনে করে সেই জীবাত্মাকে 'ঈশ্বর' নামে অভিহিত করেছেন—**'শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ'** (১৫।৮)। যদি মানুষ ভগবান ছাড়া আর কাউকে নিজের বলে মনে না করে তাহলে তার ভুলবশত মেনে নেওয়া অনাথ-ভাব দূর হয়ে যায় এবং সনাথ-ভাব অনুভূত হয়।

বাস্তবে ভগবানই চিরকাল আমাদের। সংসার আগে আমাদের ছিল না, পরেও আমাদের থাকবে না আর এখনও তার ক্রমাগত আমাদের সঙ্গে বিচ্ছেদ হচ্ছে। কিন্তু ভগবান আগেও আমাদের সঙ্গে ছিলেন, পরেও থাকবেন এবং এখনও আছেন। আমরা যদি কখনও তাঁকে না পাই

তাহলেও তিনি আমাদের, সর্বদা যদি পাই তাহলেও আমাদের এবং কখনো পাই বা না-পাই তাহলেও তিনি আমাদের। কিন্তু সংসারকে সর্বদা প্রাপ্ত বলে দেখা গেলেও তা আমাদের নয়। তার কারণ, যে সর্বদা আমাদের সঙ্গে থাকে না এবং আমরা যার সঙ্গে সর্বদা থাকি না তা নিজের হতে পারে না। সে-ই আপন হতে পারে যে সর্বদা আমাদের সঙ্গে থাকে এবং আমরাও তার সঙ্গে সর্বদা থাকি অর্থাৎ যার আমাদের থেকে কখনো বিচ্ছেদ হয় না এবং আমাদেরও তার সঙ্গে বিচ্ছেদ হয় না।

একটি খুবই আশ্চর্যের কথা হল এই যে সংসারে যাকে আমরা আপন বলে মনে করি তা তো থাকে না কিন্তু তার সঙ্গে মেনে নেওয়া আপনত্ব থেকে যায়। অর্থাৎ সম্বন্ধী থাকে না, সম্বন্ধ থাকে। যেমন, অনেক দিন আগে বিধবা হয়েছেন কোনো নারীর কান স্বামীর নাম শোনামাত্র খাড়া হয়ে যায় অর্থাৎ স্বামী না থাকলেও স্বামীর সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ থেকে যায় যে 'আমি অমুক লোকের স্ত্রী'। এখানে এই প্রশ্ন ওঠে যে, বাবা মারা যাওয়ার পর ছেলে যদি বাবার সঙ্গে পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ না মানে তাহলে পিতার নিমিত্ত শ্রাদ্ধ-তর্পণ সে কীভাবে করবে ? কেননা এক্ষেত্রে শাস্ত্রে শ্রাদ্ধ-তর্পণ করার বিধান রয়েছে। এর উত্তর হল নিজের সুখের জন্য, নিজের সুখভোগের জন্য গড়ে তোলা সম্বন্ধই হল বন্ধনকারী। পিতৃঋণ শোধ করবার জন্য মেনে নেওয়া সম্বন্ধ বন্ধন নয়, বরং তা সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ করায়।[১]

---

[১]ঋণী এবং অপরাধীর সহজে মুক্তি হয় না। ফল ভোগ করলে অথবা দান-পুণ্য প্রভৃতি শুভকর্মের দ্বারা পাপ তো দূর হয়, কিন্তু ঋণ এবং অপরাধ দূর হয় না। যার কাছে ঋণ নেওয়া হয়েছে অথবা যার কাছে অপরাধ করা হয়েছে সে যদি ক্ষমা করে দেয় তাহলে ঋণ এবং অপরাধ থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। মূলত সংসারকে নিজের মনে করলেই মানুষ ঋণী, গোলাম, অনাথ, তুচ্ছ তথা পতিত হয়। যে সংসারকে এতটুকু নিজের মনে করে না, সে কারো ঋণী বা অপরাধী হয় না। কারণ যখন আধারই থাকবে না তাহলে আর ঋণ, অপরাধ প্রভৃতি কোথায় থাকবে—'মূলাভাবে কুতঃ শাখা ?'

তাৎপর্য হল বস্তুগুলিকে যদি নিজের বলে মনে হয় তবে সেগুলিকে কেবল অপরের সেবার জন্যই ব্যবহার করা উচিত, সদুপযোগ করার জন্যই সেগুলি নিজের। যদি ব্যক্তিকে নিজের বলে মনে হয় তাহলে তা কেবল তার নিঃস্বার্থ সেবার জন্যই নিজের। নিজের জন্য কিছুই নিজের নয়। নিজের সুখ-আরামের জন্য বস্তু-ব্যক্তিকে নিজের মনে করা হল জন্ম-মৃত্যুর কারণ—**'কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু'** (গীতা ১৩।২১)। এইজন্য যে সংসারের কোনো কিছুকে নিজের মনে করে সে তো কিছুই পায় না আর যে কোনো কিছুকে নিজের বলে মনে করে না সে সবকিছু পায় অর্থাৎ সে ভগবানকে পায়।

নিজের বুদ্ধি, বিচার, সামর্থ্যের দ্বারা বস্তুর অপব্যবহার না করে তার সদ্ব্যবহার করলে বস্তুর সঙ্গে যে স্বীকৃত সম্বন্ধ, তা দূর হয়ে যায় এবং নিঃস্বার্থভাবে সেবা করলে ব্যক্তি প্রভৃতির সঙ্গে যে স্বীকৃত সম্বন্ধ রয়েছে তা দূর হয়ে যায়। সম্বন্ধ দূর হলে মুক্তি লাভ হয়। এখানে প্রশ্ন ওঠে যে সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার পরও জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ অপরের সেবায় (হিতে) কেন যুক্ত থাকেন ? এর উত্তর হল সাধনাবস্থা থেকেই তার স্বভাব হল সকল প্রাণীর কল্যাণ করা—**'সর্বভূতহিতে রতাঃ'** (গীতা ৫।২৫, ১২।৪)। এইজন্য কিছু করা, জানা, পাওয়ার শেষ না থাকলেও তাঁর মধ্যে সকলের কল্যাণ করার স্বভাব থাকে—**'স্বভাবস্তু প্রবর্ততে'** (গীতা ৫।১৪)। তাৎপর্য হল, অপরের কল্যাণে রত থাকায় তাঁর যখন সংসার থেকে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয়ে যায় তখন আর তাঁকে কল্যাণ করতে হয় না ; প্রত্যুত পূর্বের স্বভাববশত তাঁর দ্বারা স্বতঃই অপরের কল্যাণ সাধিত হয়।

ভগবান ছাড়া আমরা যাকেই নিজের মনে করি তা অশুদ্ধ হয়ে যায়, কেননা মমতাই হল মল (অশুদ্ধি) —**'মমতা মল জরি জাই'** (শ্রীশ্রীরামচরিতমানস ৭।১১৭ক)। শুধু তাই নয়, তাকে নিজের মনে করে আমরা তার মালিত হতে চাই, কিন্তু বাস্তবে হয়ে যাই তার দাস ;

তাকে ঠিক করতে চাই, কিন্তু বাস্তবে তা বেঠিক হয়ে যায়। আমরা যে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহং তথা স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়, ধন, জমি, বাড়ি প্রভৃতিকে নিজের বলে মনে করি সেগুলি সব অশুদ্ধ হয়ে যায় এবং তার সংস্কারে অর্থাৎ শোধরানোয় বাধা এসে যায়। কিন্তু সেগুলিকে যদি নিজের মনে না করি তাহলে সেগুলি ভগবানের শক্তিতে শুদ্ধ হয়ে যায়, প্রসাদে পরিণত হয়, সেগুলিতে বিশিষ্টতা এসে যায় ; কারণ, বাস্তবে সেগুলি ভগবানেরই।

তাৎপর্য হল এই যে বাস্তবে নিজের মনে করলে সেটি অশুদ্ধ হয়ে যায় এবং আমরা অনাথ ও পরাধীন হয়ে যাই। আমরা যদি বস্তুকে নিজের বলে মনে না করি তাহলে বস্তু শুদ্ধ হয়ে যায় এবং আমরা নিজেদের সনাথ অবস্থা এবং স্বাধীনতা অনুভব করতে পারি।

৪ জিজ্ঞাসা এবং বোধ

প্রকৃতপক্ষে জিজ্ঞাসার বিষয় হল জীব এবং জগৎ, পরমাত্মা নয়। তার কারণ হল অপূর্ণ জ্ঞান (সন্দেহ) থেকেই প্রশ্ন উত্থিত হয়। অর্থাৎ যে বিষয় সম্পর্কে আমরা কিছুটা জানি এবং কিছুটা জানি না সেই বিষয়েই প্রশ্ন উত্থিত হয়।[১] অতএব যে বিষয়ে কিছুই জানা নেই এবং যে বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে জানা আছে—এদের কোনোটিতে প্রশ্ন উত্থিত হয় না, কেননা সে সম্পর্কে তার উপলব্ধি থাকে। পরমাত্মা সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। তাই পরমাত্মা জিজ্ঞাসার বা বিচার করার বিষয় নয়, তা হল মেনে নেওয়ার বিষয়। জীব এবং সংসারকে আমরা সম্পূর্ণরূপে জানি না ; যেমন 'আমি আছি' এবং সংসার আছে এটুকু তো জানি ; কিন্তু আমি কী এবং সংসার কী এই তত্ত্ব আমার জানা নেই। তাই জীব এবং সংসার হল জিজ্ঞাসার বিষয়।

যদিও শাস্ত্রে পরমাত্মাকেও জিজ্ঞাসার বিষয় বলে মানা হয়েছে— **'জগজ্জীবপরাত্মনাম্'**, তথাপি এই জিজ্ঞাসার বিষয় তাঁদের জন্যই যাঁরা বেদাদি শাস্ত্রের প্রতি এবং ভক্তদের প্রতি শ্রদ্ধা-বিশ্বাস পোষণ করেন। বেদাদি শাস্ত্রে এবং ভক্তবাণীতে পরমাত্মার বর্ণনা করা হয়েছে। সেজন্য তাঁদের সেই বর্ণনা নিয়ে পরমাত্মা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা জাগ্রত হয়। তাৎপর্য হল এই যে পরমাত্মাকে নিয়ে প্রশ্ন তাঁদের মনেই আসে যাঁরা শাস্ত্র এবং সন্তদের মানেন। অর্থাৎ শাস্ত্রে লেখা আছে, ভক্তদের কাছ থেকে শোনা গিয়েছে, কিন্তু অনুভব হয়নি— এই নিয়েই জিজ্ঞাসা হয়। যাঁরা বেদাদি

---

[১]যতটুকু জানা আছে তাকেই সম্পূর্ণ মনে করে জ্ঞানের অহংকার করলে মানুষ নাস্তিক হয়ে যায়, এবং তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে, যতটুকু জানা আছে তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে এবং না-জানার বিষয়টি জানতে উদ্গ্রীব হলে মানুষ জিজ্ঞাসু হয়ে যায়।

শাস্ত্র এবং ভক্তদের মানেন না, তাঁদের মনে পরমাত্মাকে নিয়ে প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু জীব এবং সংসার সম্পর্কে প্রশ্ন আস্তিক-নাস্তিক সকলের মনেই উঠতে পারে। কেননা আমি আছি এবং সংসার আছে— এই অনুভূতি সকলেরই থাকে। পরমাত্মা সম্পর্কে এইরকম অনুভূতি না হওয়ায় পরমাত্মা তাঁদের মান্যতার বিষয় হয়ে থাকেন অর্থাৎ তাঁরা পরমাত্মাকে হয় মানেন, নয়তো মানেন না। এইজন্য আস্তিক এবং নাস্তিক—দু'রকম দর্শন পাওয়া যায়।

জিজ্ঞাসুর মধ্যে 'আমি হলাম জিজ্ঞাসু' এই ধরনের এক অহংভাব অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত অহংভাব থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ কথা শিখে নেয়, কিন্তু সে সম্পর্কে তার বোধ হয় না। কিন্তু সত্যকারের জিজ্ঞাসা থাকলে তার মধ্যে এই ব্যাকুলতা সৃষ্টি হয় যে 'আমি তো এত কিছু জেনে নিলাম কিন্তু আমার মধ্যে কোনো পরিবর্তন হল না, আমার মধ্যে কোনো বিশিষ্টতা এল না। রাগ (আসক্তি)-দ্বেষ, আনন্দ-দুঃখ যেমনকার তেমনই হয়, আগের মতোই আনুকূল্য এবং বিরুদ্ধতার প্রভাব পড়ে।' এই ব্যাকুলতা সৃষ্টি হলে অহংবোধ সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয়। অহংবোধ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিমুখ হয়ে গেলে জিজ্ঞাসু আর থাকে না, থেকে যায় শুদ্ধ জিজ্ঞাসা এবং সেই জিজ্ঞাসা জ্ঞানে (বোধে) পরিণত হয়ে যায়। জ্ঞান হলে অহংবোধ অর্থাৎ প্রকৃতি তথা প্রকৃতির কার্য সর্বতোভাবে অবিদ্যমান হয়ে যায় এবং চেতন স্বরূপ যেমনকার তেমন থেকে যায় অর্থাৎ তা লব্ধ হয়। এখানে এই কথাটি জেনে নেওয়া দরকার যে জ্ঞান জড়েরই হয়ে থাকে, চেতনার নয়। তার কারণ, চেতনা হল জ্ঞানস্বরূপ। অন্তঃকরণে জড়তাকে গুরুত্ব দিলে চেতনা সম্পর্কে অনুভূতি আসে না। তার অনুভূতি এলে শুধুমাত্র অনুভূতিই থেকে যায়, অনুভবকারী থাকে না ; জ্ঞান থাকে, জ্ঞানী থাকেন না।

~~০~~

৫ অহংবোধের বিনাশ এবং তত্ত্বের অনুভূতি

সকল দেশ, কাল, ক্রিয়া, বস্তু, ব্যক্তি, অবস্থা, পরিস্থিতি, ঘটনা প্রভৃতির অবিদ্যমানতা হয়ে যাওয়ার পরও যা অবশিষ্ট থাকে তা-ই হল তত্ত্ব। সেই তত্ত্বের অবিদ্যমানতা কখনো হয়নি, তার অভাব হয় না, হবে না এবং তা হতে পারে না। সেই তত্ত্বেই আমাদের স্থিতি স্বাভাবিকভাবে রয়েছে। তা আমাদের থেকে দূরে নেই এবং আমরাও তা থেকে দূরে নেই। তা আমাদের থেকে রহিত নয় এবং আমরাও তা থেকে রহিত নই। তা আমাদের ত্যাগ করতে পারে না, আমরাও তাকে ত্যাগ করতে পারি না। সেই তত্ত্বই সকলের প্রকাশক, সকলের আধার, সকলের আশ্রয়, সকলের রক্ষক, সকলের উৎপাদক, সকলের জ্ঞাতা, প্রেমাস্পদ, অন্তরাত্মা, আত্মদৃক্, বিশ্বাত্মা—তাঁকে এইরকম অনেক নামে অভিহিত করা হয়। সেই নিত্যপ্রাপ্ত তত্ত্বকে অনুভব করতে কোনো মানুষই অসমর্থ, পরাধীন, অনধিকারী নয়। সেই তত্ত্ব কেবল প্রবল অভিলাষ থাকলেই পাওয়া যায়।

তত্ত্বকে নিয়ে দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত প্রভৃতি যে দার্শনিক ভেদ আছে তার প্রতি আগ্রহই হল তত্ত্বের অনুভূতির পক্ষে বাধা[১]। কারণ হল তত্ত্বে কোনো ভেদ নেই। যত দার্শনিক ভেদ আছে তা ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ অহংভাব থাকে। অহংবোধ থেকে পরিচ্ছিন্নতা এবং পরিচ্ছিন্নতা থেকে বিভেদ উৎপন্ন হয়। অতএব

---

[১]নিজেদের মতের প্রতি যাঁদের আগ্রহ থাকে তাঁরা হলেন মতবাদী, মতবাদীদের কথা যথার্থ হয় না। সাধুরা বলেছেন—

মতবাদী জানৈ নহীঁ, ততবাদী কী বাত। সূরজ ঊগা উল্লুবা, গিনৈ অঁধেরী রাত॥
হরিয়া তত্ত বিচারিয়ৈ, ক্যা মত সেতী কাম। তত্ত বসায়া অমরপুর, মতকা জমপুর ধাম॥
হরিয়া রত্তা তত্ত কা, মত কা রত্তা নাঁহি। মতকা রত্তা সে ফিরৈ তাঁহ তত পায়া নাঁহি॥

যতক্ষণ অহংবোধ থাকে ততক্ষণ বিভেদ বিনষ্ট হয় না। অহংবোধ দূর হলে কোনো ভেদাভেদ থাকে না, কেবল তত্ত্বই থেকে যায়।

অহংবোধ কী, এ নিয়ে চিন্তা করুন। গীতাতে বলা হয়েছে— **'অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা'** (৭।৪) ; **'মহাভূতান্যহংকারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ'** (১৩।৫)। সাংখ্যকারিকায় বলা হয়েছে—**'প্রকৃতের্মহান্ ততোঽহংকারঃ'**। শ্রীমদ্ভাগবতে সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক তিন প্রকারের অহংবোধের বর্ণনা আছে— **'বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিবৃৎ'** (১১।২৪।৭)। এইসব অহংবোধ সম্পূর্ণরূপে জড়ের (প্রকৃতির) বাচক। এইজন্য ভগবান অহংবোধকে **'ইদম্'** (এই) করে বলেছেন ; যেমন **'এতদ্ যো বেত্তি'** (১৩।১)। তাৎপর্য হল এই যে অহংবোধ হল প্রকাশ্য এবং তত্ত্ব প্রকাশক। অহংবোধ জ্ঞেয় (যাকে জানা যায়) এবং তত্ত্ব হল জ্ঞাতা। প্রকাশ্যের সঙ্গে প্রকাশকের এবং জ্ঞেয়র সঙ্গে জ্ঞাতার সম্পূর্ণরূপে ঐক্য কখনো হতে পারে না।

জীব অহংবোধের সঙ্গে তাদাত্ম্য করে নিজেকে 'আমি আছি' বলে অনুভব করে।[১] এতে 'আমি' হল প্রকৃতির অংশ এবং 'আছি' হল চেতনার অংশ। তাৎপর্য হল 'আমি'-র 'না'-এর সঙ্গে এবং 'আছি'-র 'আছে'র সঙ্গে ঐক্য আছে। বস্তুত 'আমি'-র সঙ্গে সম্বন্ধ আছে বলেই 'আছি' বলা হয়। যদি 'আমি'-র সম্বন্ধ ছেড়ে দিই তাহলে 'আছি' থাকবে না, বরং 'আছে' থাকবে। সেই 'আছে' হল তত্ত্বের স্বরূপ।

যখন জীব ভুলক্রমে নিজের মধ্যে অহংকে স্বীকার করে নেয় তখন তার মধ্যে জড়তা, পরিচ্ছিন্নতা, বৈষম্য, অবিদ্যমানতা, অশান্তি, কর্তৃত্ব,

---

[১]অহংবোধের সম্বন্ধ থেকেই আমি, তুমি, এ এবং সে—এই চাররকম ভেদ হয়ে থাকে। অহংবোধের সম্বন্ধ না থাকলে আমি, তুমি, এ এবং সে এই চারটি থাকবে না, বরং এইগুলির প্রকাশক এক 'আছে' থাকবে। সেই 'আছে'র মধ্যে এই চারটিই নেই।

ভোক্তৃত্ব, প্রভৃতি বিকার এসে যায়। অতএব নিজের মধ্যে স্বীকৃত অহংকে দূর করার জন্য নিজের মধ্যে তত্ত্ব (সত্তা)-কে স্বীকার করতে হবে ; কেননা তত্ত্বে অহংভাব নেই। অহংভাবকে দূর করলে জড়তা, পরিচ্ছিন্নতা, বৈষম্য প্রভৃতি বিকারগুলি সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে যায়। নিজের মধ্যে তত্ত্বকে স্বীকার করা বিভেদ (দ্বৈতভাব)-এর পোষক নয় বরং তা হল বিভেদের বিনাশক। কারণ নিজের মধ্যে তত্ত্বকে স্বীকার করলে অহংভাব থাকে না। অহং-ই যখন থাকবে না তখন অহং থেকে উৎপন্ন হয় যে বিভেদ এবং বিকার তা থাকবে কী করে ?

অহংভাবকে দূর করার জন্য 'আছি'-র জায়গায় 'আছে' কে স্বীকার করে নিতে পারেন, আবার 'আছি-কে 'আছে'-তে সমর্পিত করতে পারেন অর্থাৎ 'আছে' রূপে সর্বব্যাপী পরমাত্মতত্ত্বের শরণাগত হন। এরকম করলে অহংভাব থাকবে না অর্থাৎ আমি-তুমি-এ-সে থাকবে না। কেবল 'আছে' থেকে যাবে। যেমন, ছুরিকে তরমুজের উপরে রাখুন অথবা তরমুজকে ছুরির উপরেই রাখুন, কাটবে তরমুজই। তেমনই 'আছে'-কে 'আছি'-তে মেলান অথবা 'আছি'-কে 'আছে'-তে মেলান 'আছি'র বিনাশ হবেই এবং 'আছে' থেকে যাবে।

প্রকৃতপক্ষে দেখলে বোঝা যাবে যে 'আছে'-কে 'আছি'-তে মেলানো অপেক্ষা 'আছি'-কে 'আছে'-তে মেলানো শ্রেয়। কারণ হল এই যে 'আছি'-র মধ্যে আগে থেকেই বিচ্ছিন্নতার সংস্কার থাকে। এইজন্য 'আছে'-কে 'আছি'-র মধ্যে মেনে নিলে বিচ্ছিন্নতা তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। এইজন্য স্বরূপে স্থিত হওয়া অপেক্ষা স্বকীয় পরমাত্মায় আশ্রয় নেওয়া শ্রেয়[১]। যখন স্বরূপ অহং থেকে বিমুখ হয়ে পরমাত্মার শরণাগত হয় অর্থাৎ 'আমি কেবল ভগবানের, অন্য কারো

---

[১]পরমাত্মা ছাড়া আর কেউ স্বকীয় (নিজের) হতে পারে না, কেননা বাস্তবিকপক্ষে স্বকীয় সেই হতে পারে যে আমাদের থেকে ভিন্ন হতে পারে না এবং আমরাও তার থেকে ভিন্ন হতে পারি না। যা কখনো কাছে আসে আবার কখনো দূরে চলে যায় সে স্বকীয় হতে পারে না।

বিন্দুমাত্র নই' — এই বাস্তবিকতাকে যখন আমরা স্বীকার করে নিই তখন সেই মায়া (অপরা প্রকৃতি) কেটে যায় অর্থাৎ তার অহংবোধ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যায় — **'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে'** (গীতা ৭।১৪)। তাৎপর্য হল এই যে স্বরূপে স্থিত হলে সূক্ষ্ম অহং তো থাকতে পারে কিন্তু ভগবানের আশ্রয় নিলে অহংভাব সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে যায়। কারণ ভগবান স্বয়ং শরণাগত ভক্তের অহংভাবকে বিনাশ করে দেন।[১] অহংভাব বিনষ্ট হয়ে গেলে দেশ, কাল, ক্রিয়া প্রভৃতি থাকে না, কিন্তু আছে (সৎ) থেকে যায়। জ্ঞানী তো থাকে না কিন্তু জ্ঞান (চিৎ) থেকে যায় ; সুখ-দুঃখ তো থাকে না, কিন্তু আনন্দ থেকে যায় অর্থাৎ এক সৎ-চিৎ-আনন্দঘন তত্ত্ব থেকে যায়। একে গীতা **'বাসুদেবঃ সর্বম্'** (৭।১৯) বলেছেন।

সেই তত্ত্ব সকল দেশ, কাল, ক্রিয়া প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ হয়ে আছে,

---

[১]বিবেকের প্রাধান্য আছে এমন ভক্তেরা অহং-এর আশ্রয় থেকে মুক্ত হয়ে অর্থাৎ সংসারের আশ্রয় ত্যাগ করে ভগবানের আশ্রিত হয়ে যান। কিন্তু যাঁদের মধ্যে বিবেকের প্রাধান্য নেই, তবে ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা-বিশ্বাস বেশি আছে তেমন ভক্তেরা অহংবোধের সঙ্গে (যেমনকার তেমনভাবে) ভগবানের আশ্রিত হয়ে থাকেন। এমন ভক্তদের অহংবোধের বিনাশ ভগবান স্বয়ং করেন—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপয়ান্তি তে॥
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥

(গীতা ১০।১০-১১)

'সদাসর্বদা আমাতে মগ্ন এবং প্রেমের সঙ্গে আমার ভজনাকারী ভক্তদের আমি বুদ্ধিযোগ দিয়ে থাকি। তার ফলে তারা আমাকে প্রাপ্ত হয়।'

'সেই ভক্তদের কৃপা করার উদ্দেশ্যে তাদের স্বরূপে স্থিত আমি তাদের মধ্যেকার অজ্ঞানজনিত অন্ধকারকে দেদীপ্যমান জ্ঞানরূপ প্রদীপের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করে দিই।

কিন্তু তাতে দেশ, কাল, ক্রিয়া প্রভৃতি নেই। সেই তত্ত্বের প্রাপ্তির জন্য কিছু করা হল বাস্তবে তত্ত্ব থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া। তার কারণ ক্রিয়া হলে কর্তা থাকবে আর তত্ত্ব অপ্রাপ্ত হবে। অনুরূপভাবে আত্মচিন্তন করলে আত্মবোধ হবে না, কেননা আত্মচিন্তন করলে চিন্তক থাকবে এবং অনাত্মার সত্তা থাকবে। তত্ত্বকে পাওয়া যায়নি মনে করলে তবেই তো তার প্রাপ্তির জন্য ক্রিয়া হবে। অনাত্মার সত্তা মনে করলে তবেই তো অনাত্মার ত্যাগ এবং আত্মার চিন্তন করা হবে !

তত্ত্বকে জানার চেষ্টা যদি করেন তাহলে তত্ত্ব থেকে দূরে থেকে যাবেন, কেননা তত্ত্বকে জ্ঞেয় (জানার বিষয়) বলে মনে করে নিলে তবেই তো তাকে জানতে চাইবেন ! তত্ত্ব তো সকলের জ্ঞাতা, জ্ঞেয় নয়। সকলের জ্ঞাতার আর কেউ জ্ঞাতা হতে পারে না। যেমন, চোখ দিয়ে সবকিছু দেখেন, কিন্তু চোখ দিয়ে চোখকে দেখতে পারেন না, কেননা চোখকে দেখার শক্তি ইন্দ্রিয়ের বিষয় নয়। অতএব সেই তত্ত্ব নিজেই নিজের জ্ঞাতা—

'স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম' (গীতা ১০।১৫)

বিষয় করন সুর জীব সমেতা। সকল এক তে এক সচেতা॥
সব কর পরম প্রকাসক জোঈ। রাম অনাদি অবধপতি সোঈ॥

(শ্রীশ্রীরামচরিতমানস ১।১১৭।৩)

প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ ছাড়া তত্ত্বের চিন্তন, মনন প্রভৃতি হতে পারে না। অতএব যদি তত্ত্বের চিন্তন করেন তাহলে চিত্ত সঙ্গে থাকবে ; যদি মনন করেন তাহলে মন সঙ্গে থাকবে ; যদি নিশ্চয় করেন তাহলে বুদ্ধি সঙ্গে থাকবে ; যদি দর্শন করেন তাহলে দৃষ্টি সঙ্গে থাকবে, যদি শ্রবণ করেন তাহলে শ্রবণেন্দ্রিয় সঙ্গে থাকবে, যদি কথকতা করেন তাহলে বাণী সঙ্গে থাকবে। এইভাবে যদি 'আছে'-কে মেনে নেন তাহলে মান্যতা এবং মান্যকারী থেকে যাবে আর যদি 'না'-কে নিষেধ করেন তাহলে নিষেধকারী থেকে যাবে। কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ যদি করেন

তাহলে 'আমি কর্তা নই'—এই সূক্ষ্ম অহংকার থেকে যাবে। অর্থাৎ ত্যাগ করলে ত্যাগী (যে ত্যাগ করে) থেকে যাবে। **এইজন্য মান্যতা (অঙ্গীকার) করবেন না, অস্বীকারও করবেন না ; গ্রহণ করবেন না, ত্যাগও করবেন না, বরং যেমন আছে তেমনই থাকতে দিন।** অর্থাৎ **'আছে'-তে স্থিত থেকে অন্তর-বাহিরে চুপ করে থাকুন।** চুপ করে **থাকতে হবে এই আগ্রহও (সংকল্প) রাখবেন না।** তা না হলে কর্তৃত্ব এসে **যাবে।** তার কারণ **চুপ হল স্বতঃসিদ্ধ।**

আমি, তুমি, এ, সে—এই চারটিকে ত্যাগ করলে কেবল 'আছে' (সত্তামাত্র) থেকে যায়। সেই 'আছে'-তে স্থিত (চুপ) হয়ে যান এবং নিজের দিক থেকে কোনো কিছু চিন্তা যেন না করেন—**'আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ'** (গীতা ৬।২৫)। যদি নিজে থেকেই কোনো চিন্তন এসে যায় তবে তার প্রতি রাগ (আসক্তি) বা দ্বেষ করবেন না ; তার প্রতি রাজি বা গররাজি হবেন না ; তাকে ভালো বা মন্দ মনে করবেন না। তাকে নিজের বলে মনে করবেন না, নিজের মধ্যে বলেও মনে করবেন না। বস্তুত তাকে উপেক্ষা করুন, তার প্রতি উদাসীন হয়ে যান। প্রকৃতপক্ষে তা নিজের মধ্যে নেই। তার প্রতি রাগ (আসক্তি) বা দ্বেষ করা এক বিবাদ। এই বিবাদ তত্ত্বকে অনুভব করার ক্ষেত্রে প্রধান বাধা—**'তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ'** (গীতা ৩।৩৪)।

এইভাবে যদি দু-এক সেকেন্ডও চুপ (সত্তাতে স্থিত) হয়ে যান তাহলে তা থেকে শক্তি পাওয়া যাবে, এই শক্তি সংসর্গের প্রতি রুচি, সংসারের প্রতি আসক্তিকে বিনাশ করে দেবে। কারণ হল অক্রিয় তত্ত্বে অপার শক্তি আছে। সকল শক্তিই অক্রিয় তত্ত্ব ('আছে') থেকে প্রকট হয়, তাতেই স্থিত থাকে এবং তার মধ্যেই লীন হয়ে যায়। সংসারে প্রত্যেক ক্রিয়ার পরে অক্রিয়তা আসে এবং সেই অক্রিয়া থেকে আবার ক্রিয়া করার শক্তি আসে। যেমন, কথা বলতে বলতে যদি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকা যায় তাহলে আবার কথা বলার শক্তি আসে। চলতে চলতে

যদি ক্লান্ত হয়ে পড়ে যান তো কিছুক্ষণ পর আবার চলার শক্তি আসে। সারাদিন কাজ করে রাত্রে যদি নিদ্রা যান তাহলে শরীরে আবার সুস্থতা এসে যায়, কাজ করবার শক্তি এসে যায়। এইভাবে প্রত্যেক ক্রিয়া, বৃত্তি প্রভৃতির সন্ধিতে ওই অক্রিয় তত্ত্ব স্ফূরিত হয়—

সব বৃত্তি হ্যাঁয় গোপীকা, সাক্ষী কৃষ্ণ স্বরূপ।
সন্ধিমেঁ ঝলকত রহে, ইয়-হ হ্যায় রাস অনূপ॥

সেই অক্রিয় তত্ত্বে চুপ হয়ে গেলে ওই স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্বের অনুভূতি এসে যাবে। বাস্তবে চুপ হল স্বতঃসিদ্ধ, স্বাভাবিক এবং সহজ। এর জন্য কোনো কিছু করতে হয় না, কেবল 'নেই'-কে অস্বীকার করতে হয়।

~~○~~

৬ করণ-নিরপেক্ষ তত্ত্ব

যার দ্বারা ক্রিয়ার সিদ্ধি হয়, যা ক্রিয়াকে উৎপন্ন করে তাকে 'কারক' বলা হয়। কারক হয় ছয় প্রকারের—কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান এবং অধিকরণ। এই ছ'টি কারকের প্রয়োজনীয়তা আছে সাংসারিক কাজকর্মের সিদ্ধির জন্যই। পরমাত্মতত্ত্ব পাওয়ার জন্য কারকগুলির প্রয়োজন নেই অর্থাৎ সেখানে কারক চলে না। তার কারণ, পরমাত্মতত্ত্বের প্রাপ্তি ক্রিয়ার দ্বারা হয় না। তাৎপর্য হল, সবগুলি কারক প্রকৃতিতে আছে এবং সেগুলি প্রকৃতির কাজ। প্রকৃতির অতীত তত্ত্বে কোনো কারক নেই। কারকগুলিতে প্রকৃতিজাত পদার্থ এবং ক্রিয়ার আশ্রয় নিতে হয়। তার দ্বারা অভ্যাসের সিদ্ধি হয়। অভ্যাসের দ্বারা একটি নতুন অবস্থার সৃষ্টি হয়। তার দ্বারা তত্ত্বের অনুভূতি হয় না। কেননা তত্ত্বে কোনো অবস্থা নেই। তত্ত্বের অনুভূতি তো কেবল বিবেকের দ্বারাই হয়ে থাকে। এই বিবেক সকল প্রাণী স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্ত। কিন্তু মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীদের মধ্যে যে বিবেক আছে তার দ্বারা তাদের শরীর-নির্বাহ হয়ে গেলেও তার দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান হয় না। তার কারণ তারা (মানুষ ছাড়া অন্যান্য সমস্ত প্রাণী) কেবল শরীর-নির্বাহের জন্যই বিবেকের ব্যবহার করে থাকে। এর বেশি (শরীরের অতীত তত্ত্বে) তাদের কোনো জিজ্ঞাসা থাকে না।[১] মানুষ তার নিজের

---

[১]অন্য প্রাণীদের মধ্যে এই বিবেক স্থাবর অপেক্ষা জঙ্গমেই বেশি থাকে। জঙ্গমের মধ্যেও জলচর প্রাণীদের অপেক্ষা স্থলচর প্রাণীদের মধ্যে এবং স্থলচর প্রাণীদের অপেক্ষা নভচর প্রাণীদের মধ্যে বিবেক বেশি থাকে। কিন্তু তাদের এই বিবেক শরীর-নির্বাহের মধ্যেই সীমিত থাকে। এর দ্বারা তারা খাদ্য-অখাদ্য, ঠান্ডা-গরম, পরিশ্রম-আরাম, সংযোগ-বিয়োগের পার্থক্য অনুভব করতে পারে, কিন্তু তাদের মধ্যে সৎ-অসৎ, কর্তব্য-অকর্তব্যের বিবেক জাগ্রত থাকে না। কেননা

বিবেকের সদ্ব্যবহার করে, বিবেককে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে দেবতাদেরও ওপরে উঠতে পারে, ভগবানকেও নিজের বশে আনতে পারে। অন্যদিকে ভোগেচ্ছার কারণে নিজের বিবেকের অপব্যবহার করে, বিবেককে অশ্রদ্ধা করে পশুদের চেয়েও নীচে নেমে যেতে পারে আর চুরাশি লক্ষ যোনি তথা নরকে পতিত হতে পারে।[১] এইজন্য মানুষের উচিত নিজের বিবেককে শ্রদ্ধা করা, বিবেক-বিরোধী কোনো কাজ না করা।

তাদের মধ্যে বিবেকের যোগ্য বুদ্ধি নেই, অধিকারও নেই। এই বিবেক মানুষের মধ্যেই জাগ্রত হয়। কেননা মানুষ ছাড়া অন্য যোনিজাত প্রাণী ভোগপ্রধান। মানুষ তার নিজের বিবেককে প্রাধান্য দিয়ে শরীরের অতীত তত্ত্বকে প্রাপ্ত করতে পারে, জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। অতএব মানুষের ওপর নিজেদের উদ্ধার করবার বিশেষ দায়িত্ব আছে। কারণ যার কাছে ইনকাম (আয়) আছে তার ওপর ইনকাম ট্যাক্স চাপে।

[১]মানুষ হয়েও নিজের বিবেককে শ্রদ্ধা না করার ফলে যে পতন হয়, পশুদেরও তেমন পতন হয় না। মিথ্যা, কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতা, অন্যায়, হিংসা প্রভৃতি পাপ কেবল মানুষই করে, পশুরা করে না। পশুরা নতুন পাপ করে না, তারা পূর্বজন্মের কৃত পাপের ফল ভোগ করে উন্নতির দিকে যায়। কিন্তু মানুষ সুখ-লোলুপতার কারণে নতুন নতুন পাপ করে পতনের দিকে যায়। তারা নিজের বিবেককে নতুন নতুন পাপের অনুসন্ধানে লাগিয়ে দেয়। ভোগাসক্তির জন্য তাদের বিবেক ইন্দ্রিয়গুলির ভোগেই সীমিত থাকে, তার ওপরে ওঠে না—'কামোপভোগ-পরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ' (গীতা ১৬।১১)। এইভাবে পশুরা নিজেদের কর্মের ফল ভোগ করে মনুষ্যযোনির দিকে যায় আর মানুষ নতুন নতুন পাপ করে পশু-যোনিরও নীচে নরকে চলে যায় এবং চলে যাচ্ছে! এইজন্য এমন মানুষদের সঙ্গকে নরকবাসের চেয়েও খারাপ বলা হয়েছে—

'বরু ভল বাস নরক কর তাতা। দুষ্ট সঙ্গ জনি দেই বিধাতা॥'

(শ্রীশ্রীরামচরিতমানস ৫।৪৬।৪)

তার কারণ নরকে তো পাপ দূর হয়ে শুদ্ধি হয়, কিন্তু দুষ্টের সঙ্গ থেকে অশুদ্ধি এসে যায়, ফলে নতুন পাপ তৈরি হয়।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই অপরা (জড়) এবং পরা (চেতন) — দুটি প্রকৃতি আছে। অহং[১] হল অপরা প্রকৃতি আর জীব হল পরা প্রকৃতি। অহং এবং জীবের অর্থাৎ জড় ও চেতনের সম্বন্ধের নাম হল চিজ্জড়গ্রন্থি —

জড় চেতনহি গ্রন্থি পরি গঈ। জদপি মৃষা ছূটত কঠিনঈ॥

(শ্রীশ্রীরামচরিতমানস ৭।১১৭।২)

জড়-চেতনের এই গ্রন্থি মিথ্যা, সত্য নয় ; কেননা জড় এবং চেতন সর্বদা পরস্পরের বিরোধী। চেতন হল প্রকাশক আর জড় প্রকাশ্য। চেতন অপরিবর্তনীয়, জড় পরিবর্তনশীল। চেতন কখনো দূর হয় না, জড় কখনো টিকে থাকে না। উভয়ের স্বভাব ভিন্ন। কিন্তু স্বভাব ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও একের সঙ্গে অপরের বৈরিতা-বিরোধিতা নেই। শুধু তাই নয়, চেতন হল জড়ের প্রকাশক, তার সহায়ক। অসৎ-এর সিদ্ধিও সৎ-রূপ চেতনার দ্বারাই হয়ে থাকে। চেতনাই অসৎ-কে সত্তা দেয়। হ্যাঁ, তত্ত্বের জিজ্ঞাসার সঙ্গে অসৎ (জড়)-এর বৈরতা আছে, কেননা

---

[১]গীতায় ভগবান অপরা প্রকৃতির আটটি প্রভেদের কথা বলেছেন—পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহংকার (৭।৪-৫)। এই সবগুলির মধ্যে বন্ধনের মূল কারণই হল 'অহংকার'। পৃথিবী, জল, তেজ প্রভৃতিতে পরস্পরের মধ্যে খুব তারতম্য থাকলেও সেগুলি সব এক জাতিরই (অপরা)। অতএব পৃথিবী যে জাতির অহংকারও সেই জাতির। অর্থাৎ অহংকারও মাটির ঢেলার মতো জড়। এই রহস্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করবার জন্য ভগবান অহংকারকে 'ক্ষেত্র' জানিয়ে 'এতৎ' পদের প্রয়োগ করেছেন—'এতদ্যো বেত্তি' (১৩।১)। এইভাবে 'অহংভাবকে' বিস্তারিত বলার তাৎপর্য হল এই যে এটি নিজের স্বরূপ থেকে ভিন্ন এবং জ্ঞাত। কারণ হল ইদম্ (এই) কখনো স্বয়ং (স্বরূপ) হয় না আর স্বরূপও কখনো ইদম্ হয় না। জীব ভুলক্রমে এই 'অহংবোধে'র সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে নেয় অর্থাৎ অহংভাবকে নিজের স্বরূপ বলে মেনে নেয়। তাতে তার আকর্ষণ জড়ের দিকে যায় এবং সে জড়ের বশীভূত হয়ে যায়।

জিজ্ঞাসার ফলে জড়ের সঙ্গে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ হয়ে যায়। এইজন্য এক দৃষ্টিতে তত্ত্ব অপেক্ষা তত্ত্বের জিজ্ঞাসা শ্রেষ্ঠ। ভোগেচ্ছা তো সংসারের (পদার্থ এবং ক্রিয়ার) সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত করে, কিন্তু জিজ্ঞাসা সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ ভেঙে দেয়। ভোগেচ্ছায় জড়তা (অহংকার)-এর প্রাধান্য থাকে আর জিজ্ঞাসায় চেতনার প্রাধান্য থাকে। তাৎপর্য হল এই যে মানুষ জড়-অংশের প্রাধান্যে সংসারের, ভোগের ইচ্ছা করে এবং চেতন-অংশের প্রাধান্যে নিজের উদ্ধারের, মুক্তির, পরমাত্মতত্ত্বের ইচ্ছা (জিজ্ঞাসা) করে।

মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত জড়-অংশ (অহংভাব)-এর প্রাধান্যে সংসারের ভোগে লিপ্ত থাকবে ততক্ষণ সে কখনোই পরম শান্তি, পরম আনন্দ লাভ করবে না। ব্রহ্মপদ পেয়ে গেলেও সে পরম শান্তি পাবে না। পরিবর্তনশীল বস্তুর দ্বারা অপরিবর্তনীয় বস্তু কী করে শান্তি পেতে পারে ? অসৎ-এর দ্বারা সৎ-এর পূর্তি কিভাবে হতে পারে ? কিন্তু যখন মানুষ চেতনার প্রাধান্য নিয়ে (জড়তাকে ত্যাগপূর্বক) অগ্রসর হবে তখন জড়-অংশ (অহংভাব) দূর হয়ে যাবে এবং শুদ্ধ চেতনা-বোধ থেকে যাবে। জড়-অংশ সর্বতোভাবে দূর হয়ে গেলে আসক্তির সম্পূর্ণরূপে অবিদ্যমানতা হয়ে যাবে। আসক্তির সর্বতোভাবে অবিদ্যমানতা হয়ে গেলে পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে।[১] অর্থাৎ সে কৃতকৃত্য, জ্ঞাতজ্ঞাতব্য এবং প্রাপ্তপ্রাপ্তব্য হয়ে যাবে। বাস্তবে পূর্ণতা তো স্বতঃসিদ্ধ। জড়তার সম্বন্ধের ফলে পূর্ণতার অনুভূতি হয় না। জড়ের সম্বন্ধের অত্যন্তাভাব হলে, জড়ের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে অসঙ্গ হলে পূর্ণতার অনুভূতি স্বতঃই হয়ে যায়, যা আগে থেকেই বিদ্যমান। তবে কেবল পরমাত্মতত্ত্বের, স্বরূপের বোধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা থাকলেই ; ভগবানের প্রেমের, দর্শনের অভিলাষ

---

[১]যতক্ষণ পর্যন্ত আসক্তি সম্পূর্ণরূপে অবিদ্যমান না হয় ততক্ষণ বড় বড় কথা বলতে পারেন, গভীর চিন্তা করতে পারেন, বক্তৃতা দিতে পারেন, বই লিখতে পারেন ; কিন্তু পরম শান্তি লাভ করতে পারেন না।

থাকলেই এটি হবে। তাৎপর্য হল জিজ্ঞাসা থাকলে বিবেক বিশেষরূপে জাগ্রত হবে, তাতে জড়ের সঙ্গে অসঙ্গতা হয়ে যাবে। অসঙ্গতা হয়ে গেলেই জড়ের নিবৃত্তি অর্থাৎ অহংকারের অবিদ্যমানতা হয়ে যাবে। অহংকার না থাকলে মমতাও স্বাভাবিকভাবে দূর হয়ে যাবে[১] এবং নিজের অসঙ্গ স্বরূপের অনুভূতি হবে। এতে কোনো কারক নেই।

সব কারকের মধ্যে 'কর্তা' ; মুখ্য। কর্তাতে চেতনার ঝলক আসে, অন্য কারকে আসে না। বাস্তবে 'কর্তা' চেতনার নাম নয়। এটি হল স্বীকৃত কর্তা—'**অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে**' (গীতা ৩।২৭)। এইজন্য গীতায় ভগবান যেখানে কর্মসিদ্ধির জন্য পাঁচটি হেতু (অধিষ্ঠান, কর্তা, করণ, চেষ্টা এবং দৈব) বলেছেন সেখানে শুদ্ধ আত্মা (নিজের স্বরূপ)-কে যে কর্তা বলে মনে করে তার নিন্দা করেছেন এই বলে যে তার বুদ্ধি শুদ্ধ নয়, সে দুর্মতি।[২] কারণ, স্বরূপে কর্তৃত্ব এবং ভোক্তৃত্ব, দুটি নেই—'**শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে**' (গীতা ১৩।৩১)। স্বরূপ যখন কর্তা নয় তাহলে কর্তা কে হয় ? ভগবান এটিকে গীতায় নানাভাবে বলেছেন ; যেমন, সমস্ত ক্রিয়া প্রকৃতির দ্বারাই হয় অর্থাৎ প্রকৃতি হল কর্তা (১৩।২৯) ; সমস্ত ক্রিয়া সম্পন্ন হয় গুণের

[১]চেতনা যখন জড়ের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত করে তখন তার মধ্যে আমি-ভাব উৎপন্ন হয়। শরীরে আমি-ভাব এবং আমার-ভাব (অহংবোধ এবং মমতা) দুটিই থাকে এবং অন্য পদার্থে আমার-ভাব থাকে। কিন্তু পদার্থ নিয়ে নিজেদের মধ্যে অহংকার করলে আমার-ভাবও সেই সঙ্গে এসে যায় এবং তা দৃঢ় হয়ে যায়। যেমন—আমি ধনী ইত্যাদি। (নিজের মধ্যে বিদ্যা, বুদ্ধি, যোগ্যতা প্রভৃতি আরোপ করলে 'অহংকার' হয় এবং ধন-সম্পত্তি, জমি-জায়গা প্রভৃতি নিয়ে নিজের মধ্যে শ্রেষ্ঠতার আরোপ করায় 'দর্প' হয়)। জড়-অংশ দূর হলে আমি-ভাব এবং আমার-ভাব থাকে না, স্বরূপ থেকে যায়। স্বরূপে আমি-ভাব এবং আমার-ভাব দুটিই থাকে না।

[২]তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্মানং কেবলং তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ॥ (গীতা ১৮।১৬)

দ্বারা গুণই গুণগুলির মধ্যে অধিষ্ঠান করে অর্থাৎ গুণ হল কর্তা (৩।২৭-২৮, ১৪।২৩) ; গুণ ছাড়া আর কেউ কর্তা নয় (১৪।১৯) ; ইন্দ্রিয়গুলি ইন্দ্রিয়গুলির বিষয়গুলিতে অধিষ্ঠান করে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় হল কর্তা (৫।৯)। তাৎপর্য হল, কর্তৃত্ব প্রকৃতিতেই আছে, স্বরূপে নেই। সেইজন্য নিজ চেতন স্বরূপে স্থিত তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষ 'আমি কিছুই করি না' এইটি অনুভব করেন —'**নৈব কিঞ্চিৎকরোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ**' (গীতা ৫।৮) '**তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ। গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে**' (গীতা ৩।২৮)। ভগবানও বলেন যে, যখন মানুষ গুণগুলিকে ছাড়া অন্য কাউকে কর্তা বলে মনে করে না অর্থাৎ প্রত্যেক ক্রিয়া সম্পর্কে তার মনে হয় যে গুণগুলি ছাড়া আর কোনো কর্তা নেই এবং নিজেকে গুণগুলি থেকে সম্পূর্ণরূপে সম্বন্ধহীন অনুভব করে (যা যথার্থ[১]) তখন সে আমার স্বরূপকে প্রাপ্ত হয়।[২]

গীতায় ভগবান কর্তৃত্বে প্রকৃতিকে এবং ভোক্তৃতে পুরুষকে হেতু বলে জানিয়েছেন।[৩] পুরুষ (চেতন)কে ভোক্তৃত্বতে হেতু কেন বলেছেন ? সুখ-দুঃখের অনুভূতি অর্থাৎ ভোগ চেতনেই হতে পারে, জড়েতে নয়। চেতনেই সুখী-দুঃখী হয়ে থাকে। ক্রিয়া হয় জড়েতে। কিন্তু ক্রিয়ার ফল (সুখী-দুঃখী হওয়া) পুরুষে হয়। কিন্তু বাস্তবে প্রকৃতিস্থ অর্থাৎ অহং-এ স্থিত পুরুষই সুখ-দুঃখের ভোক্তা হয়ে থাকেন—'**পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্**' (গীতা ১৩।২১)। তাৎপর্য

---

[১]স্বরূপ (আত্মা) গুণগুলি থেকে সম্পূর্ণরূপে রহিত—'নির্গুণত্বাৎ' (গীতা ১৩।৩১)। গুণ প্রকাশ্য, আত্মা প্রকাশক। গুণ পরিবর্তনশীল আত্মা অপরিবর্তনীয়। গুণ অনিত্য, আত্মা নিত্য।

[২]নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি॥ (গীতা ১৪।১৯)

[৩]কার্যকরণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥ (গীতা ১৩।২০)

হল অহংভাবের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকলেই পুরুষ সুখ-দুঃখের ভোক্তা হয়ে যায়। যদি অহংভাবে সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকে তাহলে পুরুষ সুখ-দুঃখের ভোক্তা হয় না অর্থাৎ সে সুখী-দুঃখী না হয়ে নিজের স্বতঃসিদ্ধ আনন্দরূপে স্থিত থাকে—'**সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ**' (গীতা ১৪।২৪)। অর্থাৎ ভোক্তাভাব কেবল কাল্পনিক, বাস্তবে তা নেই। তাৎপর্য হল চেতনে কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব প্রথম থেকেই নেই, এইজন্য এইগুলি দূর হয়ে যায়।[১] যদি চৈতন্যের মধ্যে কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব থাকত তাহলে চৈতন্য থাকা পর্যন্ত সেগুলি কখনোই দূর হত না।

যখন স্বরূপে কর্তৃত্বই নেই, 'কর্তা'-রূপী কারকের সঙ্গে লেশমাত্রও সম্পর্ক নেই, তাহলে অন্য কারকগুলির সঙ্গে এর সম্বন্ধ কী করে হতে পারে ? অতএব সাধককে প্রথমেই সিদ্ধান্তপূর্বক এই নির্ণয় করতে হবে যে তাঁর স্বরূপে কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব, অহংভাব-মমত্ব নেই। যদিও এই নির্ণয় বুদ্ধিতে (করণে) দৃষ্ট হয় তথাপি 'এগুলি আমার মধ্যে নেই' — এই অনুভূতি নিজেরই হয়ে থাকে। নিজের দ্বারা এই অনুভব করা করণ-নিরপেক্ষ সাধনা। তাৎপর্য হল, প্রথমে বুদ্ধির দ্বারা বিচার হয়। বিচারের পর বুদ্ধির এই নির্ণয় হয় যে আমার মধ্যে সম্পূর্ণ কারকের অবিদ্যমানতা রয়েছে। তবে এই অবিদ্যমানতার অনুভবকারী হল স্বয়ং। এই-যে অনুভূতি স্বয়ং করে থাকে তাতে কোনো করণ নেই। বরং করণের সঙ্গে হল তার সম্বন্ধ বিচ্ছেদ।

যে স্থানে ক্রিয়া হয় তাকে অধিষ্ঠান (অধিকরণ) বলে। কিন্তু যেখানে স্বয়ং-ই হল অধিষ্ঠান, সেখানে ক্রিয়া নেই। অর্থাৎ স্বয়ং কোনো ক্রিয়ার অধিষ্ঠান নয়। স্বয়ং-এ সবকিছুর সংস্থাপন হয়ে থাকে, কেননা স্থাপিত হওয়ার জায়গাই হল তত্ত্ব। তত্ত্ব ছাড়া আরোপিত বস্তুর কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নেই। এইজন্য স্বয়ংকে সকলের অধিষ্ঠান, আশ্রয়,

---

[১]যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবদ্ধতে॥ (গীতা ১৮।১৭)

আধার, প্রকাশক বলা হয়।

এইভাবে স্বয়ং-এ কর্তা, কর্ম, করণ, অধিকরণ প্রভৃতি একটি কারকও নেই।[১] অতএব স্বরূপের বোধ অথবা পরমাত্মতত্ত্বের প্রাপ্তি জড়তার দ্বারা হয় না, বরং জড়তার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হলেই হয়।

~~○~~

---

[১]কারকগুলির মধ্যে কর্তা, কর্ম, করণ এবং অধিকরণ— এই চারটি তো ক্রিয়ায় বিকৃত (পরিণত) হয়ে থাকে, কিন্তু সম্প্রদান ও অপাদান ক্রিয়াতে বিকৃত হয় না, বরং এগুলি ক্রিয়ার কেবল সহায়কই হয়ে থাকে। এইজন্য এইগুলিতে কর্ম-কর্তৃ প্রয়োগ হয় না। যেমন 'সুপাত্রকে দান দিয়েছে'— এটি হল সম্প্রদান কারক। দান দিলে দাতার মধ্যে কোনো বিকৃতি আসে না। কেউ যদি গ্রহীতা না থাকে তাহলে দান সিদ্ধ হয় না। এইজন্য দানে সহায়ক হওয়ায় তাকে কারক বলা হয়েছে। এইভাবেই 'গ্রাম থেকে এসেছে'— এটি হল অপাদান কারক। গ্রাম থেকে এলে গ্রামে কোনো বিকৃতি হয় না, বরং আসার সহায়ক হওয়ায় একে কারক বলা হয়েছে।

কর্ম চার প্রকারের — উৎপাদ্য, বিকার্য, সংস্কার্য এবং আপ্য। (কোথাও কোথাও নির্বর্ত্য, বিকার্য এবং প্রাপ্য— এই তিন প্রকারের কথা বলা হয়েছে।) এইগুলির মধ্যে আপ্য কর্মেও কোনো বিকৃতি হয় না, যেমন, 'আমি ধন লাভ করেছি', এতে ধনের কোনো বিকৃতি হয়নি।

৭ অসৎ-এর বর্ণনা

কোনোরকম দেশ, কাল, ক্রিয়া, বস্তু, ব্যক্তি, অবস্থা, পরিস্থিতি, ঘটনা প্রভৃতিতে যা বিদ্যমান নয় তার কোনো ভাব (সত্তা)ও থাকে না। অর্থাৎ সেটি সর্বদাই অবিদ্যমান এবং তা অ-সৎ **'নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ'** (গীতা ২।১৬)।

যে কোনো একটি দেশে আছে এবং অন্য কোনো দেশে নেই, সে কোনো দেশেও নেই। যে কোনো একটি কালে আছে এবং অন্য কালে নেই সে কোনো কালেও নেই। যে এই ক্রিয়ায় রয়েছে এবং অন্য ক্রিয়ায় নেই সে কোনো ক্রিয়াতেই নেই। যে কোনো বস্তুতে আছে এবং অন্য কোনো বস্তুতে নেই সে কোনো বস্তুতেই নেই। যে কোনো ব্যক্তিতে আছে এবং অন্য কোনো ব্যক্তিতে নেই সে কোনো ব্যক্তিতেও নেই। যে কোনো এক অবস্থায় আছে এবং অন্য অবস্থায় নেই সে কোনো অবস্থাতেও নেই। যে কোনো একটি পরিস্থিতিতে আছে এবং অন্য কোনো পরিস্থিতিতে নেই, তা কোনো পরিস্থিতিতেও নেই। যা কোনো একটি ঘটনায় আছে, এবং অন্য কোনো ঘটনায় নেই, তা কোনো ঘটনাতেও নেই। অর্থাৎ তা সবেতেই অবিদ্যমান।

যে কোনো একটি শরীরে আছে, কিন্তু অন্য শরীরে নেই, সে কোনো শরীরেই নেই। যে কোনো একটি বর্ণে আছে, কিন্তু অন্য বর্ণে নেই, সে কোনো বর্ণেই নেই। যে কোনো একটি জাতিতে আছে, কিন্তু অন্য জাতিতে নেই, সে কোনো জাতিতেই নেই। যে কোনো এক আশ্রমে আছে, কিন্তু অন্য আশ্রমে নেই, সে কোনো আশ্রমেই নেই। যে কোনো সমূহে আছে, কিন্তু অন্য কোনো সমূহে নেই, সে কোনো সমূহেই নেই। যদি থাকে তবে সে সেখানে আগন্তুক।

যে কর্তৃত্ব কোনো ব্যক্তিতে আছে, কিন্তু অন্য কোনো ব্যক্তিতে নেই

সে কারো মধ্যেই নেই, অর্থাৎ বাস্তবে কর্তৃত্বই নেই। কেবল আছে বলে মনে করা হয়েছে। কাম, ক্রোধ, লোভ কখনো হয়ে থাকে এবং কখনো হয় না। তার মানে আসলে সেগুলির না-হওয়াটাই সিদ্ধ হয়। এইভাবে মদ, মোহ এবং মাৎসর্য কখনো হয়ে থাকে আবার কখনো হয় না। তার মানে আসলে সেগুলির না-হওয়াটাই সিদ্ধ হয় অর্থাৎ এগুলি সবসময় অবিদ্যমান। যদি এই বৃত্তিগুলি প্রকৃতই থাকত তাহলে এগুলির কখনো হ্রাস হত না অথবা এগুলি মিটেও যেত না।

বাস্তবে কাম-ক্রোধাদি বিকৃতিগুলির স্বতন্ত্র সত্তাই নেই। বিকৃতি এবং সত্তা পরস্পরবিরোধী। যা বিকৃতি তা সত্তা কী করে হবে ? আর যা সত্তা তা বিকৃত হবে কী করে ? কিন্তু অজ্ঞানতাবশত নিজেদের মধ্যে কামক্রোধাদিকে সত্তা মনে করে সেগুলিকে আত্মস্থ বলে মনে করা হয়। যেগুলিকে আত্মস্থ মনে করে সেগুলিকে দূর করবার চেষ্টা করায় সেগুলির সত্তা আরও দৃঢ় হয়ে যায়।[১] এইভাবে মনকে সত্তা দিলে তখনই স্ফূরণ ও সংকল্প হয়ে থাকে। স্ফূরণ এবং সংকল্প পরিবর্তনশীল। সত্তার পরিবর্তন হয় না। আর যার পরিবর্তন হয় তা সত্তা নয়।

যা সর্বদাই অবিদ্যমান, ভুল করে তার সত্তা মেনে নেওয়া হয়,

---

[১]এখানে এই একটি সংশয় উত্থিত হয় যে যখন কাম-ক্রোধাদি বিকৃতিগুলির সত্তাই নেই তাহলে সেগুলিকে আত্মস্থ মনে করলে সাধকের পতন কী করে হয় ? এর উত্তর হল, কোনও ভয়ংকর স্বপ্ন দেখলে যেমন ঘুম ভেঙে গেলেও বুক ধড়ফড় করে, শরীর কাঁপতে থাকে অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থাতেও স্বপ্নে দেখা ঘটনার প্রভাব পড়তে থাকে। তেমনই সত্তা না হওয়া সত্ত্বেও সেগুলিকে আত্মস্থ করে নেওয়ার কারণে কাম-ক্রোধাদি বিকৃতি সাধকের পতন ঘটিয়ে দেয়। পতনের অর্থ হল আগে যে স্থিতি ছিল সেই স্থিতি এখন না-থাকা ; সাধকত্ব না-থাকা। সাধকত্বই যদি না থাকে তাহলে সাধ্যের প্রাপ্তি কী করে হবে ? যেমন পতনের কথা আছে তেমনই উত্থানের কথাও আছে। অদ্বৈত তত্ত্বে গুরু-শিষ্যের ভেদ নেই, তবে গুরু-শিষ্যের সংবাদ থেকে শিষ্যের তত্ত্ব প্রাপ্তি হয়ে যায়।

মান্যতা দেওয়া হয়। মনে করে নেওয়া সত্তা, সত্তা নয় ; কল্পনা করে নেওয়া সত্তাও সত্তা নয়। স্বীকৃত সত্তাও সত্তা নয়। এইভাবে জগতের শুনে নেওয়া, কথিত হওয়া এবং চিন্তা করে নেওয়া সত্তার কোনো সত্তা হয় না। কেননা বাস্তবে সংসারের স্বতন্ত্র সত্তাই নেই। কিন্তু স্বয়ং সৎ-স্বরূপ ; অতএব স্বয়ং যাকে সত্তা প্রদান করে তার সত্তা প্রত্যক্ষ করা যায় ; যেমন, আগুনে কাঠ, কয়লা, কাঁকর, পাথর, টিকে যা-ই রাখুন তা আগুনের মতো জ্বলজ্বল করে।

অসৎ-এর আভাস হতে পারে, কিন্তু তার সত্তা হতে পারে না। কারণ হল, যা কখনো এবং কোথাও অবিদ্যমান থাকে তা সর্বত্র এবং সবসময় অবিদ্যমানই থাকে। কিন্তু পরমাত্মার সৎ-তত্ত্ব কোনো দেশেই অবিদ্যমান হয় না, কোনো কালেও অবিদ্যমান হয় না, কোনো ক্রিয়ায় অবিদ্যমানতা হয় না, কোনো বস্তুতেও অবিদ্যমানতা হয় না। কোনো ব্যক্তিতে, কোনো অবস্থাতে, কোনো পরিস্থিতিতে এবং কোনো ঘটনাতেও অবিদ্যমানতা হয় না। যার কখনো কোথাও অবিদ্যমানতা হয় না, সে সদা-সর্বত্র কেবল বিদ্যমানই থাকে—**'নাভাবো বিদ্যতে সতঃ'** (গীতা ২।১৬)। দেশ, কাল, ক্রিয়া, বস্তু, ব্যক্তি প্রভৃতি তো আগে ছিল না, পরেও থাকবে না এবং বর্তমানেও প্রতিমুহূর্তে অবিদ্যমানে চলে যাচ্ছে। কিন্তু পরমাত্মা আগে ছিলেন, পরে থাকবেন এবং বর্তমানে যেমনকার তেমনই বিদ্যমান রয়েছেন। পরমাত্মাতে কখনো ভিন্নতা ছিল না। কখনো ভিন্নতা হবে না। কখনো ভিন্নতা নেই এবং কখনো তা হতে পারে না। তিনি নিত্য-নিরন্তর যেমনকার তেমনই থাকেন। তিনি কারো দৃষ্টিতে আছেন, কারো দৃষ্টিতে নেই—এতে তাঁর অবিদ্যমানতা প্রমাণিত হয় না। বস্তুত এটি তো দৃষ্টিদোষ। দৃষ্টির অভাব, ফলে তিনি থাকলেও তাঁকে না-থাকার মতো দেখায়।

সংসারের সহজ-স্বাভাবিক এবং নিত্য-নিরন্তর নিবৃত্তি এবং পরমাত্মার হল সহজ-স্বাভাবিক নিত্য-নিরন্তর প্রাপ্তি। সংসারের প্রতীতি হয়, প্রাপ্তি নয়। যার প্রতীতি হয় তা প্রাপ্ত হয় না আর যা প্রাপ্ত হয় তার প্রতীতি হয় না। প্রতীতির সর্বতোভাবে নিবৃত্তিই হয়ে থাকে।

এই নিবৃত্তি কখনো বিনষ্ট হয় না অর্থাৎ সংসারের যে অবিদ্যমানতা তা কখনো অবিদ্যমান হয় না, প্রত্যুত তা সর্বদা অবিদ্যমানই থাকে।

সংসারের প্রতি যাদের অনুরাগ তারা বলে 'সংসার নেই, আছেন পরমাত্মা'। সংসারের প্রতি যাদের অনুরাগ নেই তাদের কেবল বলতে হয় 'পরমাত্মাই আছেন'। যেমন, রজ্জুতে সর্প দর্শনকারী ভীত ব্যক্তিকে বলতে হয় 'সাপ নয়, দড়ি' ; কিন্তু নির্ভীক ব্যক্তিকে কেবল 'দড়ি' এইটুকুই বলতে হয়। তাৎপর্য হল সংসারের প্রতি অনুরাগ থাকলে, সংসারের সত্তা মেনে নিলে তবেই সংসারের নিবৃত্তি করতে হয়। তা না হলে যার সহজ-স্বাভাবিক নিত্য-নিরন্তর নিবৃত্তি হয় তার সম্পর্কে নিবৃত্তির কথা বলার কোনো মানে নেই।

সংসারের স্বরূপ হল পদার্থ এবং ক্রিয়া। যখন অজ্ঞানতাবশত সংসারের সত্তা মেনে নেওয়া হয় তখন পদার্থ সংগ্রহের (পাওয়ার) রুচি এবং ক্রিয়াকে নিয়ে কিছু করার রুচি হয়ে থাকে। পদার্থ সংগ্রহের এবং কর্ম করার রুচি থাকলে নিত্য নিবৃত্তিতেও প্রবৃত্তি প্রতীত হয়। কিন্তু প্রবৃত্তি প্রতীত হলেও নিবৃত্তি যেমনকার তেমনই থাকে। অতএব পদার্থ সংগ্রহ এবং কর্মের রুচির পরিণামে অবিদ্যমানতা ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না এবং অবিদ্যমানতাকে কেউই চায় না।

জীবের জড়-অংশের প্রাধান্যের ফলে সংসারের দিকে আকর্ষণ হয় এবং চেতন অংশের প্রাধান্যে পরমাত্মার দিকে আকর্ষণ হয়। আকর্ষণ দুটির প্রতি থাকলেও সংসারের আকর্ষণে পরিণামে অবিদ্যমানতাতেই থাকে অর্থাৎ কিছুই পাওয়া যায় না ; আর পরমাত্মার প্রতি আকর্ষণের পরিণামে প্রেম পাওয়া যায়, পরমাত্মাকে পাওয়া যায়, ফলে আর কিছুই পাওয়ার বাকি থাকে না। প্রেম এবং বোধ—দুটি একই। বোধ ছাড়া প্রেম হল 'আসক্তি' ; কেননা সংসার অবিদ্যমান এই বোধ না থাকলে সংসারের প্রতি আসক্তি হয়, প্রেম থাকে না আর প্রেম ছাড়া বোধ হল 'শূন্য' ; কেননা সংসার অবিদ্যমান এই উপলব্ধির অন্তিমে অভাব (শূন্যতা)-ই অবশিষ্ট থেকে যায়।

অ-সৎ থেকে ভিন্ন না হলে অসৎ সম্পর্কে জ্ঞান হয় না। কেননা

বাস্তবে অ-সৎ থেকে আমরা সম্পূর্ণরূপে ভিন্নই আছি। সৎ থেকে অভিন্ন না হলে সৎ সম্পর্কে জ্ঞান হয় না ; কারণ বাস্তবে (স্বরূপত) আমরা সৎ থেকে সম্পূর্ণরূপে অভিন্নই আছি। অ-সৎ থেকে ভিন্ন হওয়ার অর্থ অ-সতের প্রতি অনুরাগ না-থাকা আর সৎ থেকে অভিন্ন হওয়ার অর্থ সৎ-এ প্রিয়তা জাগ্রত হওয়া।

সদা-সর্বদা নিবৃত্ত থাকলেও অ-সতের প্রতি অনুরাগ, আকর্ষণ, গুরুত্বারোপ, সুখবুদ্ধি থাকায় অ-সৎ সম্পর্কে জ্ঞান অর্থাৎ নিবৃত্তি হয় না এবং সদা-সর্বদা প্রাপ্ত থাকা সত্ত্বেও সৎ-এ প্রিয়তা না থাকলে সৎ সম্পর্কে জ্ঞান অর্থাৎ প্রাপ্তি হয় না, বরং কেবল চর্চা অর্থাৎ শিখে নেওয়াটুকুই হয়ে থাকে। কেবল শিখে নিলে নিজের জ্ঞান সম্পর্কে অহংকার হতে পারে, কিন্তু অনুভূতি হয় না।

অ-সৎ এর প্রতি অনুরাগ না হলে অ-সৎ সম্পর্কে জ্ঞান হয়ে যায়। অ-সৎ সম্পর্কে জ্ঞান হলে অর্থাৎ অ-সৎ (অবিদ্যমান)-রূপে জানলেই অ-সৎ-এর নিবৃত্তি তথা সৎ-এর প্রাপ্তি হয়ে যায় এবং সকল দুঃখের নাশ হয়। সৎ-এর প্রতি প্রিয়তা জাগলে সৎ সম্পর্কে জ্ঞান হয়ে যায়। সৎ সম্পর্কে জ্ঞান হলেই অর্থাৎ সৎ-কে সৎ-(ভাব) রূপে জানলেই সৎ-এর প্রাপ্তি হয়ে যায় এবং আনন্দ লাভ হয়।

অসৎ-এর নিবৃত্তি এবং সৎ-এর প্রাপ্তি—এই দুটি একই। অনুরূপভাবেই সকল দুঃখের নাশ এবং আনন্দের প্রাপ্তিও এক। কেবল কথায় প্রভেদ। কারণ হল এই যে অ-সৎ কখনো ছিল না, এখন নেই এবং ভবিষ্যতেও হবে না। কিন্তু সৎ (পরমাত্মা) চিরকাল ছিলেন, এখনও আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন। সৎ-কে মানুন অথবা না-ই মানুন, জানুন অথবা না-ই জানুন, স্বীকার করুন অথবা না-ই করুন, অনুভব করুন অথবা না-ই করুন, সৎ-এর সত্তা সর্বদা বিদ্যমান থাকে।

~~○~~

৮ বর্ণনাতীতের বর্ণনা

[সাধকদের একান্তে বসে শুদ্ধ চিত্তে এই লেখাটি পড়া উচিত। কেবল শব্দের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে, অর্থ এবং তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি রেখে যেন তাঁরা এটি পড়েন। পড়ার পর চিন্তা করবেন এবং চিন্তা করার পর ভিতরে-বাইরে চুপ হয়ে গেলে তত্ত্বের স্বতঃসিদ্ধ স্থিরতা জাগ্রত হবে অর্থাৎ সহজ-অবস্থার অনুভূতি হবে এবং মনুষ্য জীবন সফল হবে।[১]]

সৎ-তত্ত্ব একই। সেই তত্ত্বের বর্ণনা করা যায় না। কেননা সেটি মন (বুদ্ধি) ও বাণীর বিষয় নয়—**'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ'** (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ২।৯), **'মন সমেত জেহি জান ন বানী। তরকি ন সকহিঁ সকল অনুমানী।'** (শ্রীশ্রীরামচরিতমানস ১।৩৪১।৪)। যেখানে

---

[১]এখানে এই প্রশ্ন উত্থিত হয় যে যা বর্ণনাতীত তার বর্ণনা কেমন করে হবে ? এবং যার বর্ণনা করা হয় তা কী করে বর্ণনাতীত ? এর উত্তর হল, তত্ত্ব যদিও বর্ণনাতীত তবু তাকে লক্ষ করাবার জন্য, তার বর্ণনা করা হয়েছে। গীতাতেও ভগবান **'অচিন্ত্যরূপং অনুস্মরেৎ'** (৮।৯) পদে অচিন্ত্যকে চিন্তা করার কথা বলেছেন। তাহলে যা অচিন্ত্য তার চিন্তা কী করে হবে ? আর যার চিন্তন হয় তা অচিন্ত্য হয় কী করে ? এর তাৎপর্য হল, যদিও পরমাত্মা অচিন্ত্য তবু চিন্তনকারী তাকে লক্ষ করে নিতে পারে। এইভাবে গীতায় গুণাতীতের লক্ষণ জানানো হয়েছে (১৪।২১-২৫)। তাহলে যে গুণাতীত তার লক্ষণ কী করে হতে পারে ? আর যার লক্ষণ আছে সে কী করে গুণাতীত হতে পারে ? কেননা লক্ষণ তো গুণ থেকেই হয়ে থাকে। এর তাৎপর্য হল এই যে লোকেরা পূর্বে যে শরীর এবং অন্তঃকরণে গুণাতীতের স্থিতি মানতেন সেই শরীর এবং অন্তঃকরণের লক্ষণগুলিকে সেই মহাপুরুষের দেহে আরোপ করে লোকেরা বলে থাকেন যে ইনি হলেন গুণাতীত পুরুষ। অতএব ওইসব লক্ষণ গুণাতীত মানুষকে চিনে নেওয়ার ইঙ্গিতমাত্র। এইভাবে সমতাতে স্থিত মানুষের স্থিতি চেনার জন্য জানানো হয়েছে যে যার মন সমতায় স্থিত সে সমরূপ ব্রহ্মতেই স্থিত (৫।১৯)।

বর্ণনা থাকে সেখানে তত্ত্ব থাকে না এবং যেখানে তত্ত্ব থাকে সেখানে বর্ণনা থাকে না। সেই তত্ত্বের দিকে লক্ষ থাকে না, তাই সেদিকে লক্ষ করাবার জন্যই তার বর্ণনা করা হয়। কিন্তু যখন সেটিকে লক্ষ না করে নিছক শিখে নেওয়া হয়, তখন কেবল বর্ণনাই থেকে যায় ; তত্ত্ব পাওয়া যায় না। সেদিকে লক্ষ রেখে যখন বর্ণনা করা হয় তখন বর্ণনা তো থাকে না, তত্ত্ব থেকে যায়। তাৎপর্য হল, তার বর্ণনা করতে করতে বাণী যখন থেমে যায়, তার চিন্তা করতে করতে মন যখন থেমে যায় তখন সেই তত্ত্ব স্বতঃই থেকে যায় আর তা প্রাপ্তও হয়ে যায়। বাস্তবে তা প্রথম থেকেই প্রাপ্ত ছিল, কেবল অপ্রাপ্তির ভ্রম দূর হয়ে যায়।

প্রকৃতিজনিত কোনো ক্রিয়া, পদার্থ, বৃত্তি, চিন্তন সেই তত্ত্ব পর্যন্ত পৌঁছোয় না। প্রকৃতিজনিত পদার্থ প্রকৃতির অতীত তত্ত্বে কী করে পৌঁছোতে পারে ? অতএব তত্ত্বের বর্ণনা হয় না, বরং প্রাপ্তি হয়। সেই প্রাপ্তিও অপ্রাপ্তির তুলনায় বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ সেটির অপ্রাপ্তি মেনে নেওয়া হয়েছে বলেই তার প্রাপ্তির কথা বলা হয়। বাস্তবে সেই তত্ত্ব স্বতঃই সকলেরই নিত্য-নিরন্তর প্রাপ্ত। অপ্রাপ্তি কেবল মেনে নেওয়া হয়েছে। অ-সৎকে সৎ মেনে নিলে, অপ্রাপ্তিকে প্রাপ্ত মেনে নিলে সেই তত্ত্ব অপ্রাপ্তির মতো দেখায়। অ-সৎকে যত বেশি সত্তা দেওয়া হবে, অর্থাৎ তাকে গুরুত্ব দেওয়া হবে ততই তার সত্তা দেখা যাবে এবং সেই তত্ত্ব অপ্রাপ্ত দেখাবে। অপ্রাপ্ত দেখালেও তা নিত্যপ্রাপ্ত অর্থাৎ দেখা না গেলেও তত্ত্বে কখনো বিন্দুমাত্র পার্থক্য হয় না। এইটিই হল সিদ্ধান্ত যে, প্রাপ্তি তারই হয় যা চিরকালীন প্রাপ্ত এবং নিবৃত্তি তারই হয় যার নিবৃত্তি চিরকালীন। তাৎপর্য হল, যা পাওয়া গিয়েছে তাই পাওয়া যাবে এবং ত্যক্ত হবে তাই যার ত্যাগ হয়ে রয়েছে। নতুন কিছু পাওয়া যাবে না আর ছেড়েও যাবে না। নতুন কিছু পাওয়া গেলে তা থাকবে না, চলেই যাবে।

যত কিছু ভিন্নতা সবই প্রকৃতি (অ-সৎ)-তে বিদ্যমান। তত্ত্বে কিছুমাত্র ভিন্নতা নেই। যখন প্রাকৃত পদার্থগুলিতে সত্তা মেনে নিয়ে

তাদের গুরুত্ব দিয়ে সেই তত্ত্বের বর্ণনা করা হয় তখন সেই তত্ত্ব কেবল বুদ্ধির বিষয় হয়ে যায় এবং তাতে ভিন্নতা প্রতীত হতে থাকে।[১] সকল ভিন্নতাই হল সাপেক্ষ। এটি না হলে কোনো ভিন্নতা থাকে না, তখন এক নিরপেক্ষ তত্ত্ব থেকে যায়। যেমন, দিনের সাপেক্ষে রাত্রি এবং রাত্রির সাপেক্ষে দিন। কিন্তু সূর্যে দিনও নেই রাত্রিও নেই অর্থাৎ সেখানে প্রকাশ নিত্য। সমুদ্রের সাপেক্ষে তরঙ্গ এবং তরঙ্গের সাপেক্ষে সমুদ্র ; কিন্তু জল-তত্ত্বে সমুদ্র নেই, তরঙ্গও নেই।[২] এইভাবে গুণের তুলনাত্মক বর্ণনাতে সেই তত্ত্ব সগুণ-নির্গুণ এবং আকারের তুলনাত্মক বর্ণনায়

---

[১]শাস্ত্রগুলিতে তত্ত্বের যে বর্ণনা আছে তা আমাদের দৃষ্টিতে করা। আমরা অসৎ-কে সত্তা বলে মেনে নিয়েছি, এইজন্য শাস্ত্র আমাদের দৃষ্টি অনুসারে আমাদের ভাষায় অসৎ-এর নিবৃত্তি এবং সৎ-তত্ত্বের বর্ণনা করে। দৃষ্টিভেদে অনেক দর্শনের এইটিই হল কারণ। অনেক দর্শন হওয়া সত্ত্বেও তত্ত্ব এক। যতক্ষণ দ্রষ্টা, জ্ঞাতা, দার্শনিক এবং দর্শন থাকবে ততক্ষণ তত্ত্বের বর্ণনাতেও ভিন্নতা থাকবে। যতক্ষণ পর্যন্ত ভিন্নতা থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তত্ত্ব থাকবে না। কেননা তত্ত্বে কোনো ভেদ নেই। অন্য শব্দে বললে যতক্ষণ অহং (জড়-চেতনের গ্রন্থি) থাকে ততক্ষণ ভিন্নতা থাকে। অহং দূর হয়ে গেলে কোনো ভিন্নতা থাকে না, কেবল এক তত্ত্ব (অস্তি) থেকে যায়।

[২]ঈশ্বর এবং জীবের সম্পর্কে দু'রকমের বর্ণনা আছে। এক, ঈশ্বর হলেন সাগর এবং আমি তরঙ্গ, অর্থাৎ তরঙ্গ সাগরেরই। দ্বিতীয়, আমার স্বরূপ হল সাগর আর ঈশ্বর হলেন তার তরঙ্গ। অর্থাৎ সাগর হল তরঙ্গের। এই দুটি বর্ণনায় তরঙ্গ সমুদ্রের, এরকম বলা ঠিক বলে মনে হয়। কিন্তু সমুদ্র তরঙ্গের, এইরকম বলা ঠিক হবে মনে হয় না, কেননা সাগর অপেক্ষাকৃত নিত্য এবং তরঙ্গ অনিত্য (ক্ষণভঙ্গুর)। অতএব তরঙ্গ সাগরেরই হয়, সাগর তরঙ্গের হয় না। যদি নিজেকে সমুদ্র এবং ঈশ্বরকে তরঙ্গ বলে মেনে নেন তবে সেই মান্যতা থেকে অনর্থ হবে ; কেননা সেইরকম মনে করলে অহংকার সৃষ্টি হয়ে যাবে এবং অহং (চিজ্জড়-গ্রন্থি অর্থাৎ বন্ধন) তো নিত্য থাকবে কিন্তু ঈশ্বর অনিত্য হয়ে যাবেন। তার কারণ হল জীবের মধ্যে অহম্ (ব্যক্তিত্ব)-এর অভ্যাস অনাদিকাল থেকে রয়েছে। অতএব

সেই তত্ত্বকে সাকার-নিরাকার বলা হয়। বাস্তবে তত্ত্ব সগুণ নয়, নির্গুণও নয়, সাকার নয়, নিরাকারও নয়।

সেই একই তত্ত্বকেই প্রকাশ্যের সাপেক্ষে 'প্রকাশক', আশ্রিতের সাপেক্ষে 'আশ্রয়' এবং আধেয়র সাপেক্ষে 'আধার' বলা হয়। প্রকাশ্য, আশ্রিত এবং আধেয় তো ব্যাপ্য, বিনাশী এবং অনেক হয়, কিন্তু প্রকাশক, আশ্রয় এবং আধার ব্যাপক, অবিনাশী এবং এক। প্রকাশ্য, আশ্রিত এবং আধেয় তো থাকবে না, কিন্তু প্রকাশক, আশ্রয় এবং আধার থেকে যাবে—তবে প্রকাশক, আশ্রয় এবং আধার এই নাম থাকবে না, এক তত্ত্বই থাকবে। তাৎপর্য হল, তত্ত্ব প্রকাশ্য নয়, প্রকাশকও নয় ; আশ্রিত নয়, আশ্রয়ও নয়, আধেয় নয়, আধারও নয়।

সেই এক তত্ত্বই শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে শরীরী, ক্ষেত্রের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে ক্ষেত্রী তথা ক্ষেত্রজ্ঞ, ক্ষরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে অক্ষর, দৃশ্যের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে দ্রষ্টা এবং সাক্ষ্যের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে সাক্ষী বলে কথিত হয়। তাৎপর্য হল, তত্ত্ব শরীর নয়, শরীরীও নয় ; ক্ষেত্র নয়, ক্ষেত্রী তথা ক্ষেত্রজ্ঞও নয় ; ক্ষর নয়, অক্ষরও নয় ; দৃশ্য নয়, দ্রষ্টাও নয় ; সাক্ষ্য নয়, সাক্ষীও নয়।

সেই তত্ত্ব অনেকের সাপেক্ষে এক। জড়ের সাপেক্ষে সে চেতনা, অসৎ-এর সাপেক্ষে সে হল সৎ। অ-ভাবের সাপেক্ষে সে হল ভাবস্বরূপ। অনিত্যের সাপেক্ষে সে নিত্য। উৎপন্ন বস্তুর সাপেক্ষে সে অনুৎপন্ন। বিনাশশীলের সাপেক্ষে অবিনাশী। অসৎ-জড়-দুঃখরূপ সংসারের সাপেক্ষে সে হল সৎ-চিৎ-আনন্দ-স্বরূপ। প্রাকৃত

যেখানে স্বরূপকে অহং বলবেন, সেখানে সেই অহং-ই আসবে যা অনাদিকাল থেকে রয়েছে। সেই অহংকে দূর করলেই তত্ত্বের প্রাপ্তি হবে।

উপরোক্ত দুটি কথা ছাড়াও তৃতীয় আর একটি বিশিষ্ট কথা আছে। তা হল জল-তত্ত্বে সাগর নেই, তরঙ্গও নেই। অর্থাৎ যেখানে সাগর এবং তরঙ্গের মধ্যে ভেদ নেই। সাগর এবং তরঙ্গ তো সাপেক্ষ কিন্তু জল-তত্ত্ব হল নিরপেক্ষ।

পদার্থসমূহের সাপেক্ষে সে হল প্রাপ্ত অথবা অপ্রাপ্ত। কঠিনতার সাপেক্ষে তাকে সুগম বলা হয়, নইলে যা নিত্যপ্রাপ্ত তাতে কঠিনতাই বা কী আর সুগমতাই বা কী ? তাৎপর্য হল, তত্ত্ব অনেক নয়, একও নয় ; জড় নয়, চেতনও নয় ; অসৎ নয়, সৎ-ও নয় ; অভাবরূপ নয়, ভাবরূপও নয় ; অনিত্য নয়, নিত্যও নয় ; উৎপন্ন নয়, অনুৎপন্নও নয় ; বিনাশশীল নয়, অবিনাশীও নয় ; অসৎ-জড়-দুঃখরূপ নয়, সৎ-চিৎ-আনন্দরূপও নয় ; প্রাপ্ত নয়, অপ্রাপ্তও নয় ; কঠিন নয়, সুগমও নয় অর্থাৎ শব্দের দ্বারা সেই তত্ত্বের বর্ণনা করা যায় না।

সেই তত্ত্ব পরতঃ (পরের দ্বারা)—সিদ্ধির সাপেক্ষে স্বতঃসিদ্ধ। অস্বাভাবিকের সাপেক্ষে স্বাভাবিক। অস্বাভাবিকতার ওপর স্বাভাবিকতা আরোপ করায় তা হল বন্ধন, স্বাভাবিকতার ওপর অস্বাভাবিকতা আরোপ করলে তা সংসার হয়ে যায় এবং অস্বাভাবিককে অস্বীকার করে স্বাভাবিকতাকে অনুভব করলে তা 'তত্ত্ব' হয়ে যায় আর অ-তত্ত্ব থেকে মুক্তি হয়ে যায় অর্থাৎ যেমনকার তেমনই রয়ে যায়। তত্ত্ব পরতঃ সিদ্ধ নয়, স্বতঃসিদ্ধ নয়, স্বাভাবিক নয়, অস্বাভাবিক নয়। পরতঃ সিদ্ধ-স্বতঃসিদ্ধ, স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক সবই সাপেক্ষ, কিন্তু তত্ত্ব নিরপেক্ষ।

সেই তত্ত্বকে 'অস্তি' বলা হয়। বাস্তবে তা 'নাস্তি'-র আপেক্ষিকতায় 'অস্তি' নয়, বরং তা নিরপেক্ষ। যদি আমরা 'নাস্তি'-র সত্তা মেনে নিই তাহলে তাকে 'নাস্তি' বলা যায় না। কেননা 'নাস্তি' এবং সত্তার মধ্যে পরস্পর বিরোধিতা আছে। অর্থাৎ যা নেই তার সত্তা হবে কী করে আর যার সত্তা আছে তা 'নাস্তি' কী করে হবে ? বাস্তবে 'নাস্তি'-র কোনো সত্তাই নেই। কিন্তু যখন ভুল করে 'নাস্তি'-কে সত্তা বলে মেনে নেওয়া হয় তখন সেই ভুলকে দূর করবার জন্য 'এটি নেই, তত্ত্ব আছে' এমন কথা বলা হয়। যখন 'নাস্তি'-র সত্তাই নেই তখন সত্তাকে 'অস্তি' বলারও কোনো মানে হয় না। তাৎপর্য হল, 'নাস্তি'-র

সঙ্গে তুলনা করেই 'অস্তি' বলা হয়। বাস্তবে তত্ত্ব 'নাস্তি'ও নয়, 'অস্তি'-ও নয়।

গীতায় বলা হয়েছে—

জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্ জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে॥

(গীতা ১৩।১২)

'যা জ্ঞেয়, আমি সেই তত্ত্বের ভালোভাবে বর্ণনা করব। যেটিকে জেনে মানুষ অমরতা অনুভব করে নেয়, সেই তত্ত্ব অনাদি এবং পরব্রহ্ম। তাকে সৎ-ও বলা যেতে পারে না এবং অসৎ-ও বলা যেতে পারে না।'[১]

তাৎপর্য হল সেই তত্ত্বের আদি (আরম্ভ) নেই, যা সর্বদা বিদ্যমান তার আদি কী করে হবে ? সবই অপর, তিনিই পর। তিনি সৎ-ও নন, অ-সৎও নন। আদি-অনাদি, পর-অপর এবং সৎ-অসৎ-এর বিভেদ প্রকৃতির সম্বন্ধ থেকে হয়ে থাকে। সেই তত্ত্ব তো আদি-অনাদি, পর-অপর এবং সৎ-অসৎ থেকেও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এইভাবে ভগবান জ্ঞেয় তত্ত্বের যে বর্ণনা দিয়েছেন, বাস্তবে তা বর্ণনা নয়, বরং তা হল উদ্দেশ্যকে (যা উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি নির্দেশ করে) লক্ষ করানো। এর তাৎপর্য হল জ্ঞেয়-তত্ত্বের প্রতি লক্ষ করানো, নিছক বর্ণনা করা নয়।

সাধু-সন্তদের বাণীতে আছে যে জাগৃতি নেই, স্বপ্ন নেই, সুষুপ্তি নেই, তুরীয় নেই ; না আছে বন্ধন, না আছে মুক্তি প্রভৃতি। কারণ হল

---

[১]গীতায় পরমাত্মার তিনপ্রকারে বর্ণনা আছে—

(ক) পরমাত্মা সৎ এবং অ-সৎ, দুই-ই— 'সদসচ্চাহম্' (৯।১৯) ; (খ) পরমাত্মা সৎ-ও, অসৎও এবং সৎ-অসৎ-এর ঊর্ধ্বেও—'সদসৎ তৎ পরং যৎ' (১১।৩৭) ; (গ) পরমাত্মা সৎ-ও নন, অ-সৎও নন— 'ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে' (১৩।১২) । এর তাৎপর্য হল এই যে, বাস্তবে পরমাত্মার বর্ণনা করা যায় না, কেননা তিনি মন, বুদ্ধি এবং শব্দের অতীত।

এইগুলি সবই সাপেক্ষ, কিন্তু তত্ত্ব হল নিরপেক্ষ। বাস্তবে নিরপেক্ষও সাপেক্ষের আপেক্ষিকতার দৃষ্টিতে বলা হয়ে থাকে। তাহলে তাকে কী নামে বলা হবে ? তার কোনো নাম নেই অর্থাৎ সেখানে শব্দের গতি নেই। শব্দের দ্বারা তাকে কেবল উদ্দিষ্ট করা হয়।[১]

তত্ত্ব প্রত্যক্ষ নয়, অপ্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ নয়, অপরোক্ষ নয় ; ছোট নয়, বড় নয় ; ভিতর নয়, বাহির নয় ; ওপরেও নয়, নীচেও নয় ; নিকটেও নয়, দূরেও নয়, ভেদ নয়, অভেদ নয়, ভেদাভেদও নয় ; ভিন্ন নয়, অভিন্ন নয়, ভিন্নাভিন্নও নয়। কারণ হল এই সবই তো সাপেক্ষ, কিন্তু তত্ত্ব হল নিরপেক্ষ। যেমন সূর্যতে আলো নেই, অন্ধকার নেই, আলো-অন্ধকারও নেই। কেননা যেখানে আলো থাকে, সেখানে অন্ধকার থাকে না এবং যেখানে অন্ধকার থাকে, সেখানে আলো থাকে না। তাহলে আলো-অন্ধকার দুটি একসঙ্গে কী করে থাকবে ? এইভাবেই তত্ত্বে জ্ঞান নেই, অজ্ঞান নেই আর জ্ঞান-অজ্ঞান দুটিই নেই। সেখানে জ্ঞাতা নেই, জ্ঞান নেই, জ্ঞেয় নেই ; প্রকাশক নেই, প্রকাশ নেই, প্রকাশ্য নেই ; দ্রষ্টা নেই, দর্শন নেই, দৃশ্য নেই ; ধ্যাতা নেই, ধ্যান নেই, ধ্যেয়ও নেই। তাৎপর্য হল, তত্ত্বে ত্রিপুটি সম্পূর্ণরূপে অবিদ্যমান। কেননা ত্রিপুটি হল সাপেক্ষ আর তত্ত্ব নিরপেক্ষ। বস্তুত যেখানে স্থিত হয়ে আমরা বলি, শুনি, আলোচনা করি সেখানেই সাপেক্ষ এবং নিরপেক্ষতার কথা আসে। বাস্তবে তত্ত্ব সাপেক্ষ নয়, নিরপেক্ষও নয়।

সেই তত্ত্ব বাস্তবে অনুভূতিরূপ। গীতায় তাকে 'স্মৃতি' বলা

---

[১]বর্ণনাকারী যদি তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষ হন এবং শ্রোতা যদি জিজ্ঞাসু হন তাহলে শব্দের দ্বারা শব্দাতীত, ইন্দ্রিয়াতীত তত্ত্বেরও জ্ঞান হয়ে যায়— এটি হল শব্দের বিচিত্র, অচিন্ত্য শক্তির প্রভাব। কিন্তু এমন হওয়া তখনই সম্ভব যখন কেবল শব্দের প্রতি দৃষ্টি না রেখে তত্ত্বের দিকে দৃষ্টি রাখা হয়। যদি তত্ত্বের দিকে দৃষ্টি না থাকে তাহলে কেবল শেখাই হবে অর্থাৎ নিছক বর্ণনাই সার, তত্ত্ব অনুভূত হবে না।

হয়েছে — **'নষ্টো মোহঃ স্মৃতিলব্ধা'** (১৮।৭৩)। স্মৃতিও বিস্মৃতির আপেক্ষিকতায় বিদ্যমান। কিন্তু তত্ত্ব স্মৃতি-বিস্মৃতির আপেক্ষিকতায় নেই, তা আছে অনুভূতিরূপে। কারণ হল স্মৃতি তো বিস্মৃত হতে পারে কিন্তু অনুভবের অ-অনুভূতি (বিস্মৃতি) হতে পারে না। তত্ত্বের বিস্মৃতি হতে পারে না, প্রত্যুত বিমুখতা হতে পারে। তাৎপর্য হল প্রথমে জ্ঞান ছিল পরে তার বিস্মৃতি হয়ে গেল — তত্ত্বের বিস্মৃতি এইভাবে হয় না।[১] যদি এইরকম বিস্মৃতি মেনে নেন তাহলে স্মৃতি হওয়ার পর আবার বিস্মৃতি হয়ে যাবে। তাই গীতায় বলা হয়েছে—**'যজ্ জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহম্'** (৪।৩৫) অর্থাৎ তাকে জেনে নেওয়ার পর আর মোহ হয় না। অ-ভাবরূপ অ-সৎকে ভাবরূপ মনে করে গুরুত্ব দেওয়ায় তত্ত্বের দিক থেকে দৃষ্টি সরে গিয়েছে। একেই বিস্মৃতি বলা হয়। বৃত্তিকে সরানো এবং বৃত্তিকে লাগানো, এটিও সাধকের দৃষ্টিতে হয়ে থাকে, তত্ত্বের দৃষ্টিতে নয়। তত্ত্বের দিক থেকে বৃত্তি সরে গেলে অথবা বিমুখতা এলেও তত্ত্ব যেমনকার তেমনই থাকে। অ-ভাবরূপ অ-সৎকে যদি অ-ভাবরূপেই মেনে নেওয়া হয় তাহলে ভাবরূপ তত্ত্ব স্বতঃই যেমনকার তেমন থেকে যাবে।

~~○~~

---

[১]জ্ঞান হয়ে গেলে নূতনত্ব কিছু দেখা যায় না, অর্থাৎ আগে অজ্ঞানতা ছিল এখন জ্ঞান হয়ে গেল — এসব মনে হয় না। জ্ঞান হলে এইরকম অনুভূতি হয় যে জ্ঞান তো চিরকাল ছিল, কেবল সেদিকে আমার দৃষ্টি ছিল না। যদি মানা হয় যে আগে অজ্ঞানতা ছিল এখন জ্ঞান হল তাহলে জ্ঞানের অনাদিত্ব থাকবে না, কিন্তু জ্ঞান সময়ের দ্বারা সীমিত নয়, তা অনাদি। যে সময়ের দ্বারা সীমিত তা সান্ত আর যা অনাদি তা অনন্ত।

৯ নীরব সাধনা

বাহিরে এবং ভিতরে নীরব হয়ে যাওয়া হল নীরব সাধন। অন্তরে এমন চিন্তা করে নিন যে আপনাদের কিছুই করতে হবে না। স্বার্থের জন্যও নয়, পরমার্থের জন্যও নয় ; লৌকিক বা পারলৌকিক কোনো কিছুই করতে হবে না। এমন চিন্তা করে নিয়ে বসে যান। বসবার ভালো সময় হল সকালে ঘুম থেকে উঠে। ঘুম থেকে ওঠার পরেই ভগবানকে নমস্কার করে বসে যান। গভীর ঘুমের সময় যেমন কিছু করবার জন্য বিন্দুমাত্র সংকল্প ছিল না তেমনি জাগ্রত অবস্থাতেও কোনো কিছু করবার সংকল্প যেন না থাকে। চিন্তন, জপ, ধ্যান প্রভৃতি কোনো কিছুই করতে হবে না। আবার 'চিন্তন' প্রভৃতি কিছুই করতে হবে না— এমন সংকল্পও যেন না থাকে। কারণ 'না করার' সংকল্পও তো 'করা'। বাস্তবে 'না-করা' স্বতঃসিদ্ধ। মন-বুদ্ধি প্রভৃতিকে স্বীকার করেই 'করা' হয়ে থাকে।

এখন বিন্দুমাত্র কিছু করতে হবে না এমন চিন্তা করে চুপ করে যান। মন, যদি মানতে না চায় তাহলে 'সর্বত্র এক পরমাত্মা পরিপূর্ণ'—একথা ভেবে নিয়ে নীরব হয়ে যান। যদি সগুণের উপাসনা করেন তাহলে 'আমি প্রভুর চরণে পড়ে আছি' একথা মেনে নিয়ে নীরব হয়ে যান। কিন্তু এটি দু-নম্বরের কথা, এক নম্বরের কথা হল এই যে, কিছুই করতে হবে না। এইভাবে নীরব হওয়ার পর অন্তরে যদি কোনো সংকল্প-বিকল্প উদিত হয়, কোনো কথা স্মরণে আসে তাহলে তাকে উপেক্ষা করবেন, বিরোধিতা করবেন না। তাতে সন্তুষ্ট-অসন্তুষ্ট, অনুরাগ-বিদ্বেষ করবেন না। শাস্ত্রবিহিত ভালো সংকল্প যদি আসে তবে তাতে সন্তুষ্ট হবেন না আর শাস্ত্রনিষিদ্ধ খারাপ সংকল্প যদি আসে তবে তাতে অসন্তুষ্ট হবেন না। নিজেকেও সেই সংকল্পের মধ্যে জড়াবেন না অর্থাৎ সেগুলিকে

নিজস্ব বলে মেনে নেবেন না।

আপনারা বলেন, মন খারাপ হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে মন ভালো অথবা খারাপ হয়ই না। ভালো-খারাপ কেবল স্বয়ংই হয়। স্বয়ং যদি ভালো হয় তাহলে সংকল্প ভালো হবে আর স্বয়ং যদি খারাপ হয়, তাহলে সংকল্প খারাপ হবে। ভালো-খারাপ এই দুটি প্রকৃতির সম্বন্ধ থেকে হয়ে থাকে। প্রকৃতির সম্বন্ধ ছাড়া ভালো-ও হয় না, খারাপও হয় না, যেমন সুখ এবং দুঃখ দুটি জিনিস, কিন্তু আনন্দে দুটি জিনিস হয় না অর্থাৎ আনন্দে সুখও নেই, দুঃখও নেই। এইভাবে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কশূন্য তত্ত্বে ভালোও নেই, খারাপও নেই। এইজন্য ভালো-মন্দ বিভেদ করে সন্তুষ্ট এবং অসন্তুষ্ট হবেন না।

সংকল্প আসে কিংবা যায়, তাই আগে থেকেই ঠিক করে নিন যে বাস্তবে সংকল্প আসে না, বরং যায়। অতীতে আমরা যে কাজ করেছি তা মনে পড়ে যায় অথবা ভবিষ্যতে যা করব বলে স্থির করেছি তা স্মরণে এসে যায়—যেমন সেখানে যেতে হবে, ওই কাজটা করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এইভাবে অতীত এবং ভবিষ্যতের কথা মনে আসে, যা বর্তমানে একেবারেই নেই। প্রকৃতপক্ষে সেই স্মৃতিগুলির প্রবেশ হচ্ছে না বরং সেগুলি বেরিয়ে যাচ্ছে। মনের মধ্যে যে কথা জমে আছে তা বেরিয়ে যাচ্ছে। অতএব আপনারা তার সঙ্গে সম্বন্ধ জুড়বেন না, আপনারা নিরপেক্ষ থাকবেন। সম্বন্ধ না জুড়লে সেই সংকল্পের দোষ আপনাদের লাগবে না এবং সেই সংকল্পও নিজে নিজে নষ্ট হয়ে যাবে ; কেননা নিয়মই হল—যা উৎপন্ন হয়, তা নষ্ট হয়ে যায়।

সংসারে অনেক পুণ্য কাজ করা হয় কিন্তু সেগুলি থেকে কি আমাদের পুণ্য হয় ? তেমনই সংসারে অনেক রকম পাপ কাজ করা হয় কিন্তু সেগুলি থেকে কি আমাদের পাপ হয় ? হয় না। কেন হয় না ? তার কারণ সেগুলির সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ নেই। সেগুলিতে আমাদের কোনো দায় নেই। সংসারে যেমন পাপ-পুণ্য হয়ে থাকে তেমনই মনে

সংকল্প-বিকল্প হয়ে থাকে। আমরা সেগুলি করি না, করতে চাইও না। আমরা যদি সেগুলির সঙ্গে জুড়ে যাই তাহলে সেগুলি পুণ্য এবং পাপ, ভালো এবং মন্দ রূপে পরিগণিত হয়। তাতে তাদের ফল সৃষ্টি হয় এবং সেই ফলভোগ আমাদের করতে হয়। এইজন্য সেগুলির সঙ্গে জড়াবেন না ; সেগুলিকে অনুমোদন করবেন না এবং সেগুলির বিরোধিতাও করবেন না। সংকল্প-বিকল্প যদি আসে তো আসুক। এটি করতে হবে এবং এটি করতে হবে না — এই দুটিকে ফেলে দিন। গীতায় বলা হয়েছে—

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন। (৩।১৮)

করা এবং না-করা দুটির প্রতিই আগ্রহ রাখবেন না। করার আগ্রহও হল সংকল্প এবং না-করার আগ্রহও হল সংকল্প। করাও কর্ম এবং না-করাও কর্ম। করাতেও পরিশ্রম এবং না-করাতেও পরিশ্রম। অতএব করা এবং না-করা দুটির প্রতি কোনোরকম গুরুত্ব না দিয়ে নীরব হয়ে গেলে প্রকৃতির সম্বন্ধ দূর হয়ে যায় এবং স্বতঃই পরম-বিশ্রাম প্রাপ্ত হয় ; কেননা ক্রিয়ারূপে প্রকৃতিই বিদ্যমান। সেই ক্রিয়া প্রকৃতির হোক, মনেরই হোক, —সবই প্রকৃতির। এইভাবে ভিতরে-বাহিরে নীরব হয়ে গেলে, যাকে তত্ত্বজ্ঞান বলা হয়, জীবন্মুক্তি বলা হয়, সহজ সমাধি বলা হয় তা স্বতঃই অনুভব হয়।

উত্তমা সহজাবস্থা মধ্যমা ধ্যানধারণা।
কনিষ্ঠা শাস্ত্রচিন্তা চ তীর্থযাত্রাঽধমাঽধমা॥

—খুবই ছোট সাধনা হল তীর্থযাত্রা। তার চেয়ে বড় হল শাস্ত্রচিন্তন। শাস্ত্রচিন্তনের চেয়েও বড় হল ধ্যান-ধারণা, এবং সর্বোচ্চ হল সহজাবস্থা (সহজ সমাধি)[১]—এই সহজাবস্থায় আপনারা পৌঁছিয়ে যাবেন।

---

[১]প্রবৃত্তি (করা) এবং নিবৃত্তি (না-করা)— দুটিই হল প্রকৃতির রাজ্যে। নির্বিকল্প সমাধি পর্যন্ত সবই প্রকৃতির রাজ্যে, কেননা নির্বিকল্প সমাধি থেকেও ব্যুত্থান হয়ে থাকে। প্রত্যেকটি ক্রিয়া প্রকৃতিতে হয় আর ক্রিয়া ছাড়া ব্যুত্থান

সহজাবস্থা জাগৃতি নয়, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, মূর্ছা এবং সমাধিও নয়। সুষুপ্তি এবং সহজাবস্থার মধ্যে পার্থক্য হল সুষুপ্তিতে বেহুঁশ-ভাব থাকে কিন্তু সহজাবস্থায় বেহুঁশ-ভাব থাকে না ; বরং জ্ঞান থাকে, জাগৃতি থাকে, জ্ঞানের এক দীপ্তি থাকে।

আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে। (গীতা ৪।২৭)

বাস্তবে নীরব হতে হয় না, নীরবতা স্বাভাবিক। বেদান্তের সংস্কার যাঁদের আছে তাঁরা বুঝতে পারবেন যে আত্মা কর্তা নয়, ভোক্তাও নয়। অতএব সহজাবস্থা স্বাভাবিক।

নীরব থাকার সময় যদি ঘুম পায় তাহলে জপকীর্তন করা শুরু করে দিন, দাঁড়িয়ে পড়ুন। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ঘুম না আসে ততক্ষণ 'কিছু করতে হবে না'—এই অবস্থায় (নীরব) থাকুন। দু-এক সেকেন্ডও যদি নীরব হয়ে যান তাতেও খুব লাভ। যদি আধ মিনিট নীরব হয়ে যান তাহলে খুব শক্তি সৃষ্টি হবে। নীরব থাকায় যে শক্তি সৃষ্টি হয় কিছু করার দ্বারা সেই শক্তি কখনো সৃষ্টি হয় না, বরং করার দ্বারা তো শক্তি ব্যয় হয়। আমরা কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেলে ঘুমিয়ে পড়ি। গভীর নিদ্রায় সব ক্লান্তি দূর হয়ে যায় ; মনে, ইন্দ্রিয়তে, শরীরে সতেজতা আসে। কাজ করার শক্তি আসে। এইভাবে প্রলয়ে নীরব হলে সৃষ্টির সামর্থ্য এসে যায়। মহাপ্রলয়ের নীরবতায় মহাসৃষ্টির সামর্থ্য আসে।

হওয়া সম্ভবই নয়। এজন্য চলা, বলা, দেখা, শোনা প্রভৃতির মতো দাঁড়ানো, নীরবতা, নিদ্রা, মূর্ছা এবং সমাধিস্থ হওয়াও হল ক্রিয়া। তাৎপর্য হল, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ রয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সমাধিও কর্ম। এতে সমাধি এবং ব্যুত্থান দুটি অবস্থাই হয়ে থাকে। প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ হলে কোনো অবস্থা থাকে না, বরং 'সহজ সমাধি' অথবা 'সহজাবস্থা' হয়ে থাকে, তার থেকে কখনো ব্যুত্থান হয় না।

সহজাবস্থা বাস্তবে অবস্থা নয়, বরং তা অবস্থার অতীত। অবস্থাতীত কোনো অবস্থা নয়। অবস্থাভেদ আছে প্রকৃতিতে, স্বরূপে নেই। এইজন্যই সহজাবস্থাকে সর্বোত্তম বলা হয়েছে।

এইরূপে যতরকম সামর্থ্য আছে, সবই না-করা থেকে উদ্ভূত। না-করা পরমাত্মার স্বরূপ, তা নিত্যপ্রাপ্ত —

দৌড় সকে তো দৌড় লে, জব লগি তেরী দৌড়।
দৌড় থক্যা ধোখা মিট্যা, বস্তু ঠৌড়-কী-ঠৌড়॥

না-করার যে মাহাত্ম্য, তা করার মধ্যে নেই, কখনো ছিল না, কখনো হবে না এবং হতে পারেও না। না-করার মধ্যে যে সামর্থ্য তা করার মধ্যে নেই-ই। তার কারণ, করার আরম্ভ আছে এবং শেষ আছে, অতএব করা অনিত্য। কিন্তু না-করার আরম্ভ এবং শেষ নেই, অতএব না-করা নিত্য।

কয়েক দিন ধরে চিন্তা না করলে নীরব থাকার অনুমান করা যায় না। আপনারা যদি কয়েক দিন চিন্তা করেন তাহলে বুঝতে পারবেন। এখনই বুঝতে না পারলেও 'এইরকম সহজাবস্থা হয়'—এটি মেনে নিন। এই সহজাবস্থার বর্ণনা শাস্ত্রে এবং সাধুদের বর্ণনাতেও বেশি নেই। সীন্থলে (রাজস্থান) শ্রীহরিরামদাসজী মহারাজ ছিলেন। তাঁর বাণীতে আছে—

সহজাঁ মারগ সহজ কা, সহজ কিয়া বিশ্রাম।
'হরিয়া' জীব র সীব কা, এক নাম অরু ঠাম॥
সহজ-তন মন সহজ পূজা। সহজ সা দেব নহীঁ ঔর দূজা।

তিনি নিজের পরিচয়ও এইভাবে দিয়েছেন—

হরিয়া জৈমলদাস গুরু, রাম নিরঞ্জন দেব।
কায়া দেবল দেহরো, সহজ হমারে সেব॥

'শ্রীজৈমলদাসজী মহারাজ আমার গুরু। যিনি প্রকৃতির অত্যন্ত অতীত সেই রাম আমার দেবতা। এই শরীর আমার দেবল (দেবস্থান)। সহজ (কিছু না করা)-ই হল আমার সেবা।'

কবীরদাসের বাণীতে আছে—

সাধো সহজ সমাধি ভলী।
গুরু-প্রতাপ জা দিন তেঁ উপজী, দিন-দিন অধিক চলী॥
জহঁ-জহঁ ডোলোঁ সোই পরিকরমা, জো কুছ কঁরৌ সো সেবা।

জব সোঁবো তব করৌ দণ্ডবৎ, পূজোঁ ঔর ন দেবা॥
কহোঁ সো নাম, সুনোঁ সো সুমিরন, খাঁব-পিয়োঁ সো পূজা।
গিরহ-উজাড় এক নাম লেখোঁ, ভাব ন রাখোঁ দূজা॥
আঁখ ন মূদোঁ, কান ন রূঁধোঁ, তনিক কষ্ট নহিঁ ধারৌঁ।
খুলে নৈন পহিচানোঁ হঁসি-হঁসি, সুন্দর রূপ নিহারৌঁ॥
সবদ নিরন্তর সে মন লাগা, মলিন বাসনা ত্যাগী।
উঠত-বৈঠত কবহুঁ ন ছূটে, ঐসী তারী লাগী॥
কহ কবীর য়হ উনমনি রহনী, সো পরগট করি ভাঈ।
দুখ-সুখ সে কোঈ পরে পরমপদ, তেহি পদ রহা সমাঈ॥

এইরকম অবস্থা প্রাপ্তির উপায় হল —বাহির-ভিতর থেকে নীরব হয়ে যাওয়া, অর্থাৎ কিছুই 'না করা'। কিছু 'না করলে' সবকিছুই করা হয়।

আমার করার কিছুমাত্রই নেই—না আগে কিছু করার ছিল, না এখন করার আছে এবং না পরেও করার থাকবে। ভগবানের চিন্তাও করতে হবে না। ভগবানের চরণে পতিত হতে হবে কিন্তু চরণের কথা চিন্তা করতে হবে না। সংসারের কথাও চিন্তা করতে হবে না, ভগবানের কথাও চিন্তা করতে হবে না। মনকে নিরীক্ষণ করতেও হবে না। মনকে নিরীক্ষণ তো তখনই করেন যখন মনের সঙ্গে নিজেদের সম্বন্ধ মেনে নেন। অথচ মনের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধই নেই। অতএব মনের দিকে দেখতেই হবে না। এটি কোনো সাধারণ ব্যাপার নয়, খুবই উচ্চস্তরের ব্যাপার। এ হল সকল সাধনার অন্তিম সাধনা। কিছু না-করার মধ্যে সকল সাধনা একীভূত হয়। যেমন একটি পয়সাও একশো কোটি টাকার অংশ তেমনই, যাকে পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তি, জীবন্মুক্তি, সহজ সমাধি বলা হয় এটি হল তার অংশ। এটিকে সাধুরা 'মূক সৎসঙ্গ' এবং 'অচিন্ত্যের ধ্যান'নামেও বলেছেন।

~~o~~

॥ শ্রীহরিঃ ॥

গোরক্ষপুরের গীতাপ্রেস দ্বারা এযাবৎ প্রকাশিত বাংলা বই-এর সূচীপত্র

কোড নং

(১) 1118 **শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (তত্ত্ব-বিবেচনী) বৃহৎ আকারে**
লেখক—জয়দয়াল গোয়েন্দকা
গীতা-বিষয়ক ২৫১৫টি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সমগ্র গীতা-গ্রন্থের বিষদ্ ব্যাখ্যা

(২) 763 **শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (সাধক-সঞ্জীবনী)**
লেখক—স্বামী রামসুখদাস
প্রতিটি শ্লোকের পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যাসহ সুবৃহৎ টীকা। সাধকগণের আধ্যাত্মিক পথ-নির্দেশের এক অনুপম গ্রন্থ।

(৩) 1577 **শ্রীমদ্ভাগবত (প্রথম খণ্ড)**

(৪) 1744 **শ্রীমদ্ভাগবত (দ্বিতীয় খণ্ড)**

(৫) 1574 **সংক্ষিপ্ত মহাভারত (প্রথম খণ্ড)**

(৬) 1660 **সংক্ষিপ্ত মহাভারত (দ্বিতীয় খণ্ড)**

(৭) 1662 **শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত**

(৮) 556 **গীতা-দর্পণ**
লেখক—স্বামী রামসুখদাস
শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় উল্লিখিত ১০৮টি বিষয়ের সামগ্রিক দর্শন-ভিত্তিক অভিনব আলোচনা। গীতার গভীরে প্রবেশে ইচ্ছুক জিজ্ঞাসুদের পক্ষে বইটি খুবই উপযোগী।

(৯) 13 **শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা**
অন্বয়, পদচ্ছেদসহ প্রতিটি শ্লোকের ভাবার্থসহ সরল অনুবাদ।

(১০) 496 **শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা**
মূল শ্লোকসহ সরল অনুবাদ

(১১) 1736 **গীতা প্রবোধনি** (লেখক—স্বামী রামসুখদাস)

(১২) 1393 **শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা** (বোর্ড বাইন্ডিং)

(১৩) 1444 **শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা**
অতি ক্ষুদ্র আকারে সমগ্র মূল শ্লোকের অভিনব সংস্করণ।

কোড নং

(১৪) 395 গীতা-মাধুর্য

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

প্রতিটি শ্লোকের পৃষ্ঠভূমিতে প্রশ্নোত্তররূপে উপস্থাপিত এই বইটি নবীন এবং প্রবীণ সকলকেই আকৃষ্ট করতে সক্ষম।

(১৫) 1851 গীতা রসামৃত

(১৬) 1901 সাধন-সমর বা দেবী মাহাত্ম্য

(১৭) 1937 শিবপুরাণ

(১৮) 1455 শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (লঘু আকারে)

(১৯) 1883 শ্রীরামচরিতমানস (তুলসীদাসী রামায়ণ)

গোস্বামী তুলসীদাস বিরচিত, অখণ্ড সংস্করণ, সম্পূর্ণ নূতনরূপে অনুদিত।

(২০) 275 মানুষ কর্ম করায় স্বাধীন, নাকি পরাধীন ?

লেখক—জয়দয়াল গোয়েন্দকা

সাধন পথের গূঢ় তত্ত্বের সহজ আলোচনা।

(২১) 1456 ভগবৎপ্রাপ্তির পথ ও পাথেয়

লেখক—জয়দয়াল গোয়েন্দকা

ঈশ্বরলাভের সাধনায় রত সাধকদের পক্ষে একটি অপরিহার্য পুস্তক।

(২২) 1469 সর্বসাধনার সারকথা

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

(২৩) 1119 ঈশ্বর এবং ধর্ম কেন ?

লেখক—জয়দয়াল গোয়েন্দকা

বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বইটি খুবই উপযোগী।

(২৪) 1305 প্রশ্নোত্তর মণিমালা

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক ৫০০টি প্রশ্নের মূল্যবান সমাধান সূত্র।

(২৫) 1102 অমৃত-বিন্দু

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

সূত্ররূপে উপস্থাপিত এক সহস্র অমৃত বাণীর অভূতপূর্ব সংকলন।

(২৬) 1115 তত্ত্বজ্ঞান কী করে হবে ?

লেখক—স্বামী রামসুখদাস

তত্ত্বজ্ঞান লাভের একটি সরল মার্গ-দর্শিকা।

(২৭) 1925 ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও মহত্ত্ব

(২৮) 1936 ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস

কোড নং

(২৯) 1358 **কর্ম রহস্য**
লেখক—স্বামী রামসুখদাস
ভগবান গীতায় বলেছেন **'গহনা কর্মণো গতিঃ'**—সেই কর্ম-তত্ত্বের অনুপম বর্ণনা।

(৩০) 1122 **মুক্তিলাভের জন্য গুরুকরণ কি অপরিহার্য ?**
লেখক—স্বামী রামসুখদাস
গুরু বিষয়ক বিভিন্ন শঙ্কা-সমাধানের উদ্দেশ্যে লিখিত এই পুস্তিকাটি বর্তমানে প্রতিটি লোকেরই একবার অবশ্যই পড়া কর্তব্য।

(৩১) 276 **পরমার্থ পত্রাবলী**
লেখক—জয়দয়াল গোয়েন্দকা
সাধকগণের উদ্দেশে লিখিত ৫১টি আধ্যাত্মিক পত্রের দুর্লভ সংকলন।

(৩২) 816 **কল্যাণকারী প্রবচন**
লেখক—স্বামী রামসুখদাস
সাধকগণের উদ্দেশে প্রদত্ত ১৯টি অমূল্য প্রবচনের সংস্করণ।

(৩৩) 1460 **বিবেক চূড়ামণি** (মূলসহ সরল টীকা)
শ্রীমৎ শংকরাচার্য বিরচিত জ্ঞানমার্গের সুপরিচিত গ্রন্থ।

(৩৪) 1454 **স্তোত্ররত্নাবলী**
প্রাচীন বিভিন্ন সুপ্রসিদ্ধ স্তোত্রের মূলসহ সরল অনুবাদ।

(৩৫) 1603 **উপনিষদ্**

(৩৬) 1604 **পাতঞ্জলযোগ**

(৩৭) 903 **সহজ সাধনা**
লেখক—স্বামী রামসুখদাস
সাধন পথের সহজতম দিক্-দর্শন।

(৩৮) 312 **আদর্শ নারী সুশীলা**
লেখক—জয়দয়াল গোয়েন্দকা
গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের প্রথম তিনটি শ্লোকে বর্ণিত ২৬টি দৈবীগুণকে কেন্দ্র করে একটি মহিলার জীবন-চরিত্র।

(৩৯) 1415 **অমৃত-বাণী**
লেখক—জয়দয়াল গোয়েন্দকা

(৪০) 1541 **সাধনার দুটি প্রধান সূত্র**
লেখক—স্বামী রামসুখদাস

(৪১) 1478 **মানব কল্যাণের শাশ্বত পথ**
লেখক—স্বামী রামসুখদাস
বিভিন্ন সাধন-মার্গের নির্বাচিত ২০টি প্রবচনের এক অমূল্য সংগ্রহ।

কোড নং

(৪২) 1651 হে মহাজীবন ! হে মহামরণ !!
স্বামী রামসুখদাস মহারাজের স্বপ্রসঙ্গের নির্দেশাবলী।

(৪৩) 1306 কর্তব্য সাধনায় ভগবৎ প্রাপ্তি
লেখক—জয়দয়াল গোয়েন্দকা

(৪৪) 955 তাত্ত্বিক-প্রবচন

(৪৫) 1489 গীতা দিনলিপি (Available within Nov. to Jan.)

(৪৬) 428 আদর্শ গার্হস্থ্য জীবন

(৪৭) 296 সৎসঙ্গের কয়েকটি সার কথা

(৪৮) 1359 পরমাত্মার স্বরূপ এবং প্রাপ্তি

(৪৯) 1884 ঈশ্বর লাভের বিবিধ উপায়

(৫০) 1303 সাধকদের প্রতি

(৫১) 1579 সাধনার মনোভূমি

(৫২) 1978 ঈশ্বরের পাঁচটি নিবাসস্থল

(৫৩) 1580 অধ্যাত্ম সাধনায় কর্মহীনতা নয়

(৫৪) 1581 গীতার সারাৎসার

(৫৫) 1452 আদর্শ গল্প সংকলন

(৫৬) 1453 শিক্ষামূলক কাহিনী

(৫৭) 1513 মূল্যবান কাহিনী

(৫৮) 625 দেশের বর্তমান অবস্থা এবং তার পরিণাম

(৫৯) 956 সাধন এবং সাধ্য

(৬০) স্তুতি

(৬১) 1293 আত্মোন্নতি এবং সনাতন (হিন্দু) ধর্ম রক্ষার্থে কয়েকটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য

(৬২) 450 ঈশ্বরকে মানব কেন ? নামজপের মহিমা এবং আহার শুদ্ধি

(৬৩) 449 দুর্গতি থেকে রক্ষা পাওয়া এবং সদ্‌গুরু কে ?

(৬৪) 451 মহাপাপ থেকে রক্ষা পাওয়া

(৬৫) 443 সন্তানের কর্তব্য

(৬৬) 469 মূর্তিপূজা

(৬৭) 849 মাতৃশক্তির চরম অপমান

(৬৮) 1319 কল্যাণের তিনটি সহজ পন্থা

(৬৯) 1742 শরণাগতি

(৭০) 762 গর্ভপাতের পরিণাম ? একবার ভেবে দেখুন

(৭১) 1075 ওঁ নমঃ শিবায়

(৭২) 1043 নবদুর্গা

(৭৩) 1096 কানাই

	কোড নং	
(৭৪)	1097	গোপাল
(৭৫)	1098	মোহন
(৭৬)	1123	শ্রীকৃষ্ণ
(৭৭)	1292	দশাবতার
(৭৮)	1439	দশমহাবিদ্যা
(৭৯)	1652	নবগ্রহ
(৮০)	1787	মহাবীর হনুমান
(৮১)	1495	ছবিতে চৈতন্যলীলা
(৮২)	1888	জয় শিব শংকর
(৮৩)	1889	স্বনামধন্য ঋষি-মুনি
(৮৪)	1891	রামলালা
(৮৫)	1892	সীতাপতি রাম
(৮৬)	1893	রাজা রাম
(৮৭)	1977	ভগবান সূর্য
(৮৮)	330	ভক্তিসূত্র (নারদ ও শাণ্ডিল্য)
(৮৯)	1496	পরলোক ও পুনর্জন্মের সত্য ঘটনা
(৯০)	1659	শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম
(৯১)	1881	হনুমানচালীসা (মূলপাঠ, অর্থসহ)
(৯২)	1880	হনুমানচালীসা (মূলপাঠ)
(৯৩)	1852	রামরক্ষাস্তোত্র
(৯৪)	1356	সুন্দরকাণ্ড
(৯৫)	1322	শ্রীশ্রীচণ্ডী
(৯৬)	1743	শ্রীশিবচালীসা
(৯৭)	1785	ভাগবতের মণিমুক্তা
(৯৮)	1786	মূল শ্রীমদ্‌বাল্মীকীয়রামায়ণম্‌
(৯৯)	1795	মনকে বশ করার কয়েকটি উপায় ও আনন্দের তরঙ্গ
(১০০)	1784	প্রেমভক্তিপ্রকাশ, ধ্যানাবস্থায় প্রভুর সঙ্গে বার্তালাপ
(১০১)	1797	স্তবমালা
(১০২)	1835	সত্যনিষ্ঠ সাহসী বালক-বালিকাদের কথা
(১০৩)	1834	শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (মূল) ও শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম
(১০৪)	1839	কৃত্তিবাসী রামায়ণ
(১০৫)	1838	জীবন যাপনের শৈলী
(১০৬)	1853	আমাদের লক্ষ্য ও কর্তব্য
(১০৭)	1854	ভাগবত রত্নাবলী
(১০৮)	1920	আহার নিরামিষ না আমিষ ? সিদ্ধান্ত নিজেই নিন
(১০৯)	1946	রামায়ণ মহাভারতের কতিপয় আদর্শ চরিত্র
(১১০)	1948	এর নাম কি উন্নতি, না ধ্বংস ?—একটু ভেবে দেখুন